# বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রসঙ্গ

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ


গবেষক

তপন কুমার দেবনাথ



Dhaka University Library
382761

GIFT



গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. এম. নজরুল ইস্‌লাম

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



382761



রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

১৯৯৮



ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.

M.Phil.

382761

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রসঙ্গ

তপন কুমার দেবনাথ

382761

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

## উৎসর্গ

বাবা ও মা
শ্রীযুক্ত মনরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ
শ্রীমতি অবলা দেবনাথ

382761

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রসঙ্গ**" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তপন কুমার দেবনাথ
এম. ফিল. গবেষক

ঢাকা
১৯.০৩.৯৮ইং

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য তপন কুমার দেবনাথ কর্তৃক রচিত "**বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যা : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি প্রসঙ্গ**" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি।

তারিখ ১৯.৩.১৮

ড. এম. নজরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

# সূচীপত্র


পূর্বকথা viii-xii

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র xiii-xiv

**প্রথম অধ্যায়**

**জাতিগঠন প্রেক্ষিত**

১.১ উপক্রমণিকা ১

১.২ জাতিগঠন : বিশ্ব প্রেক্ষিত ২-৫

১.৩ জাতিগঠন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৫-৭

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

**জাতিগঠন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**

২.১ জাতিগঠন ও জাতীয় সংহতি ৮

২.২ জাতীয় সংহতির তত্ত্বগত ধারণা ৯-১৪

**তৃতীয় অধ্যায়**

**বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যার প্রকৃতি**

৩.১ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার হরণ এবং ভঙ্গুর জাতিগঠন কার্যক্রম ১৫-২১

৩.২ জাতীয় পরিচয়গত সমস্যা ২১-২৯

**চতুর্থ অধ্যায়**

**রাজনৈতিক সংহতি**

৪.১ প্রাক ব্রিটিশ আমল ৩০-৩৩

৪.২ ব্রিটিশ আমল ৩৩-৪০

৪.৩ পাকিস্তানী আমল ৪১-৪৬

৪.৪ বাংলাদেশ আমল : মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবের শাসনকাল ৪৬-৫৬

৪.৫ জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকাল ৫৬-৬৩

৪.৬ সাত্তার সরকারের শাসনকাল ৬৩

৪.৭ জেনারেল এরশাদের শাসনকাল ৬৪-৭২

৪.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল ৭২-৭৩

৪.৯ বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকাল ৭৩-৭৮

৪.১০ শেখ হাসিনার শাসনকাল ৭৮-৮১

Dhaka University Institutional Repository




পঞ্চম অধ্যায়

জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি

৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও গুরুত্ব ৮২-৮৫

৫.২ কতিপয় প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ ৮৫-৯০

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতিগঠন ও সাংস্কৃতিক সংহতি

৬.১ মৌলিক উপাদান হিসেবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ৯১-৯২

৬.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত ৯২-৯৬

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যায় পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৭.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতিগঠন ৯৭-৯৯

৭.২ কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প ১০০-১০৪

৭.৩ বহিরাগত বাঙ্গালী পুনর্বাসন ১০৪-১১২

৭.৪ ভূমির অধিকার ও সমস্যা ১১৩-১১৭

৭.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দূর্বলতা ১১৭-১১৯

৭.৬ উপজাতীয় শরণার্থী সমস্যা ১১৯-১২৩

অষ্টম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য শান্তি চুক্তি

৮.১ পার্বত্য শান্তি চুক্তির কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক ১২৪-১২৮

৮.২ পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও তার প্রতিক্রিয়া ১২৯-১৩৫

নবম অধ্যায়

বিশ্লেষণ ও উপসংহার ১৩৬-১৪২

গ্রন্থপঞ্জী ১৪৩-১৫১

তথ্যপঞ্জী ১৫২-১৫৪

পরিশিষ্ট-১ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বিবরণ i-xii

পরিশিষ্ট-২ সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের গোপনীয় পত্রাবলী xiv-xvii

পরিশিষ্ট-৩ সারণী সমূহ xviii-xxv

Dhaka University Institutional Repository

# পূর্বকথা

আদিম সমাজ ব্যবস্থার বহু সোপান অতিক্রম করে মানুষ আজ সভ্য সমাজের নতুন প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। পিছনে ফেলে এসেছে ইতিহাসের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আর আনন্দ-বেদনার নানান রঙের অধ্যায়। এই সেই ইতিহাস যে আমাদের চিন্তার, মননের ও বুদ্ধিবৃত্তির চিরায়ত শিক্ষক। আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সাফল্য-অসাফল্যের পূর্বাভাস এনে দিয়ে এই ইতিহাস আমাদের চলার পথকে করে দেয় কুসুমাস্তীর্ণ। মানুষের মৌলিক চাহিদা আর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সমষ্টিগত সিদ্ধান্তের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে পরিবার, গ্রাম, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। শান্তি প্রতিষ্ঠার অদম্য উৎসাহ আর একাগ্রতার পথে কখনও মানুষ পা পিছলে কিংবা পথ ভুলে চলে এসেছে সংঘাতে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে সেই সংঘাত রূপ নিয়েছে ধ্বংসে। মানুষের সৃষ্টি শান্তি এভাবেই অশান্তির তিমিরাবরণে আচ্ছাদিত হয়েছে বারবার। আবার ভুল শুধরে সৃষ্টির প্রত্যয়ে মানুষ নিজকে করেছে নিবিষ্ট। এভাবেই শান্তি আর সংঘাত পরস্পর হাত ধরে এগিয়েছে মানুষের ভুবনে। ইতিহাস কেবল এসবের এক নীরব সাক্ষী।

স্বার্থের সংঘাত, ক্ষমতার লোভ আর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার কুটকৌশল শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা এনে দেয় তা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকালে পরিস্কার পরিদৃষ্ট হবে। এসব দেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করতে পারলেও পরবর্তীতে সরকারসমূহ জাতীয় স্বার্থে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রীভূত করতে ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত, ভাষাগত বৈষম্যগুলি স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এধরনের জাতিগঠন সমস্যার আবর্তে নিপতিত। দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ১৯৭১ সালে যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হ'ল তা পরবর্তীতে মানুষের আশা আকাঙ্খা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করতে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই দেশ গঠন প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চললেও আনুপাতিক হারে জাতিগঠনের দিকে সুদৃষ্টি দেয়া হয়নি। ফলে দেশের একপ্রান্তে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং বর্ণগত দিক দিয়ে মূল জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাদের মধ্যে জাতীয় সংহতির বীজ রোপন করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি কোন সরকারের সময়েই দেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়া সুফল বয়ে আনতে পারেনি। জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা না থাকাই এর প্রধান কারণ।

Dhaka University Institutional Repository



দীর্ঘদিন ধরে এদেশের ধর্মীয় এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হরণ করা হয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধান না করায় অসন্তোষ এবং সংঘাতের পথকে পরিহার করাও সম্ভব হয়নি। টমাস জেফারসনের মতে, "একটি জনগোষ্ঠী যত ক্ষুদ্রই হোক, তার অধিকার হরণ করা ঠিক নয়। ভুলেও যদি কোনো জনগোষ্ঠীর মনে বঞ্চনা ও শোষণের ধারণা জন্মে, তাহলেও আন্তরিকতার সাথে তা দূর করার চেষ্টা করা আবশ্যক।" কিন্তু আমাদের সরকারগুলো সে অভিপ্রায়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা দীর্ঘায়িত হতে বাধ্য হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় আমরা বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যার প্রকৃতি, গতিধারা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যা জাতিগঠনে কি ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় সংহতির ক্লাসিক্যাল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের আলোকে বিশ্ব প্রেক্ষিতে জাতিগঠনের প্রকৃতি ও গতিধারার পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বহুত্ববাদী সমাজকে কিভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণে বিচার করা হয়েছে তার আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া উপনিবেশিক প্রশাসন বহুমুখী জাতীয়তাকে একটি সংহত রূপ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন কাজে লাগায়নি তা দেখানো হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশের জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ-দিনের অসন্তোষ কেমন জটিলতার সৃষ্টি করেছে তা বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতিগঠন অথবা জাতীয়সংহতির পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সংহতির তাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে এর গতিধারা ও প্রকৃতি অনুধাবন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে নৃতত্ত্ব ও ধর্মীয় দিক থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার কিভাবে হরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে জাতিগঠন কার্যক্রমে সংখ্যালঘু জনগণকে অন্তর্ভুক্ত না করায় জাতীয় সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়গত সমস্যার উদ্ভব ও এর ক্রমবিকাশ এবং এ ধারণা রাজনীতিতে কিভাবে দু'টি মেরুর সৃষ্টি করেছে এ বিষয়েও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়গত সমস্যা জাতিগঠনে যে বাধার সৃষ্টি করেছে এ তথ্যও এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজনৈতিক সংহতি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম বিধৃত হয়েছে। প্রাক ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কিভাবে অধিকার

Dhaka University Institutional Repository



বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং বৈষম্য ও শোষণের যাঁতাকলে পড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথ বেছে নিয়েছে সে প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় ও বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কি প্রভাব ফেলেছে তার বিশ্লেষণ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কিভাবে তাঁদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ভাবধারা এনে দিয়েছে এবং একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ভূলুণ্ঠিত হলে তা জাতীয় সংহতির পথে কি ধরনের বাধা এনে দেয় তা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় কি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর দুর্দশা, ক্ষতিপূরণে সরকারের অনিয়ম এবং মানবেতর জীবন যাপনের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বহিরাগত বাঙালী পুনর্বাসনে সৃষ্ট নতুন সমস্যা, ভূমির অধিকার সংক্রান্ত জটিলতা, উপজাতীয় শরণার্থীদের নিয়ে ভোগান্তি জাতিগঠনে কি মারাত্মক বিপর্যয় এনে দিয়েছে তা আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে উত্থাপিত যুক্তি-তর্ক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতিগঠন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ এবং জাতীয় সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দিনের অসন্তোষ ও জঙ্গী বিদ্রোহ দমনে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি কিভাবে একটি ঐতিহাসিক ও সাহসী দায়িত্ব পালন করে এ বিষয়েও এ অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে।

নবম অধ্যায় সমগ্র আলোচনার উপসংহার। এতে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের সার্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আলোচনা ও সাধারণীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের সমস্যা জাতি গঠনে যে বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে তার গতিধারা ও প্রকৃতি এবং এ প্রেক্ষিতে এই সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে কতটুকু জাতীয় সংহতি অর্জন সম্ভব তা বিধৃত হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি তা হল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা। তবুও যথাসম্ভব যে গ্রন্থসমূহ সুধীজনের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যেগুলি সঠিক তথ্য ও তত্ত্বের দিক নির্দেশ দিয়েছে আমি সে সব মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে নানা ভাবে ঋণী, প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উৎস হিসেবে যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার,

Dhaka University Institutional Repository



গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ধানমণ্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, ঢাকা, সেমিনার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ইউসিস, ঢাকা, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গ্রন্থাগার, সাভার, ঢাকা উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এম. ফিল. এর কোর্স সমাপ্ত করতে প্রথম থেকেই যাঁর ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এম. নজরুল ইস্‌লাম। তিনি এ গবেষণা কর্মটি তত্ত্বাবধান করার কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। প্রধানত তাঁর মত একজন অভিজ্ঞ, সুদক্ষ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধায়কের জন্যই আমি প্রথম থেকে গভীর আগ্রহ ও উৎফুল্লতা নিয়ে এই কাজ সমাপ্ত করার শক্তি পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিমেয় এবং অপরিশোধ্য। তদুপরি, তাঁর সহধর্মিণী মিসেস্ ফিরোজা ইস্‌লাম এ গবেষণার ব্যাপারে আমাকে যে সহৃদয় ও স্নেহার্দ্র অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এজন্য আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. প্রথম পর্বের চারটি বিষয়ের উপর আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া ক্লাশ নিয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী ও ড. হারুন-অর-রশিদ। এ তিনজন অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সস্নেহ সহায়তার জন্যই টেক্সটসমূহের কঠিন অধ্যায়গুলো অত্যন্ত সহজে আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে। তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. আমিনুর রহমান, অধ্যাপিকা নাজমা চৌধুরী, ড. ভালেম চন্দ্র বর্মণ, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা সাঈদা গাফফার খালেক, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. আব্দুল লতিফ মাসুম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক পিযুষ কান্তি হরি সহ সকল শিক্ষকের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা সকলেই আমাকে অকৃত্রিম স্নেহে উৎসাহিত করে এবং আলোচনার জন্য তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে সহায়তা করেছেন।

এছাড়াও আমি যাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সুপরামর্শ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের সবার নাম এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হলনা। তবুও যাঁদের নাম স্মরণ না করলেই নয় তাঁদের মধ্যে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ সাদ্ জগলুল ফারুক, উপাধ্যক্ষ ইলিয়াস খান, অধ্যাপক দীপক রায়, অধ্যাপক সুরাজ কুমার দেবনাথ, অধ্যাপক মঞ্জুর আলম খান, অধ্যাপক কাজী মিজানুল ইসলাম, অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিক, ড. মনোরঞ্জন রাজবংশী, অধ্যাপক দেলওয়ার মফিজ, অধ্যাপক সেলিম আহমেদ এবং গ্রন্থাগারিক জনাব ইলিয়াস

Dhaka University Institutional Repository



হোসেন অন্যতম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কালী প্রসন্ন দাসকে। তাঁর আন্তরিক তাগিদ, সুপরামর্শ এবং গবেষণার গঠনগত দিক সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা আমাকে স্নেহধন্য করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমা, দীপংকর তালুকদার, বীর বাহাদুর, ধীরেন্দ্র নাথ সাহা, আনোয়ারুল ইসলাম, মহিলা সাংসদ এথিন এবং তাঁর স্বামী, জাসদের তাত্ত্বিক রাজনীতিক সিরাজুল আলম খান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কোষাধ্যক্ষ জনাব কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদ এবং সচিব এ.এস. এম. আলী কবির, খাদ্য উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব কাজী আমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাখাইন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব উসিট মং, শ্রী মদনলাল সাহা, ক্রীড়া জগত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল, বন্ধু ডা. তনিমা চৌধুরী, নিভা দেবনাথ, এনামুল ইসলাম লিটু, কাজী মাসুদুজ্জামান, এ.বি.এম. আসগর, লাকী গুপ্তা, এম. ফিল. সহপাঠি কামাল আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস আরা, শামীম আরা, মৌসুমী বিশ্বাস প্রমুখ অকৃত্রিম শুভাকাঙ্খী হিসেবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার বাবা এবং মা, মেজবোন মাধবী দেবনাথ এবং তাঁর স্বামী এ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, ভাগ্নি শুক্লা দেবনাথ, মনীষা মুনমুন, ভাগ্নে সুনাম দেবনাথ, সেজবোন আরতী দেবনাথ, ছোটবোন এ্যাডভোকেট বাসন্তী দেবনাথ, ভাইঝি সুভদ্রা সৌম্যা দেবনাথের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণার ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবেনা।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত অল্প সময়ে কম্পোজ ও সংশোধন করে দেয়ার জন্য অধ্যাপক জসিম উদ্দীন এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাকে এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু নামোল্লেখ করতে পারিনি তাঁদের সকলের প্রতি সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি।

তপন কুমার দেবনাথ

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

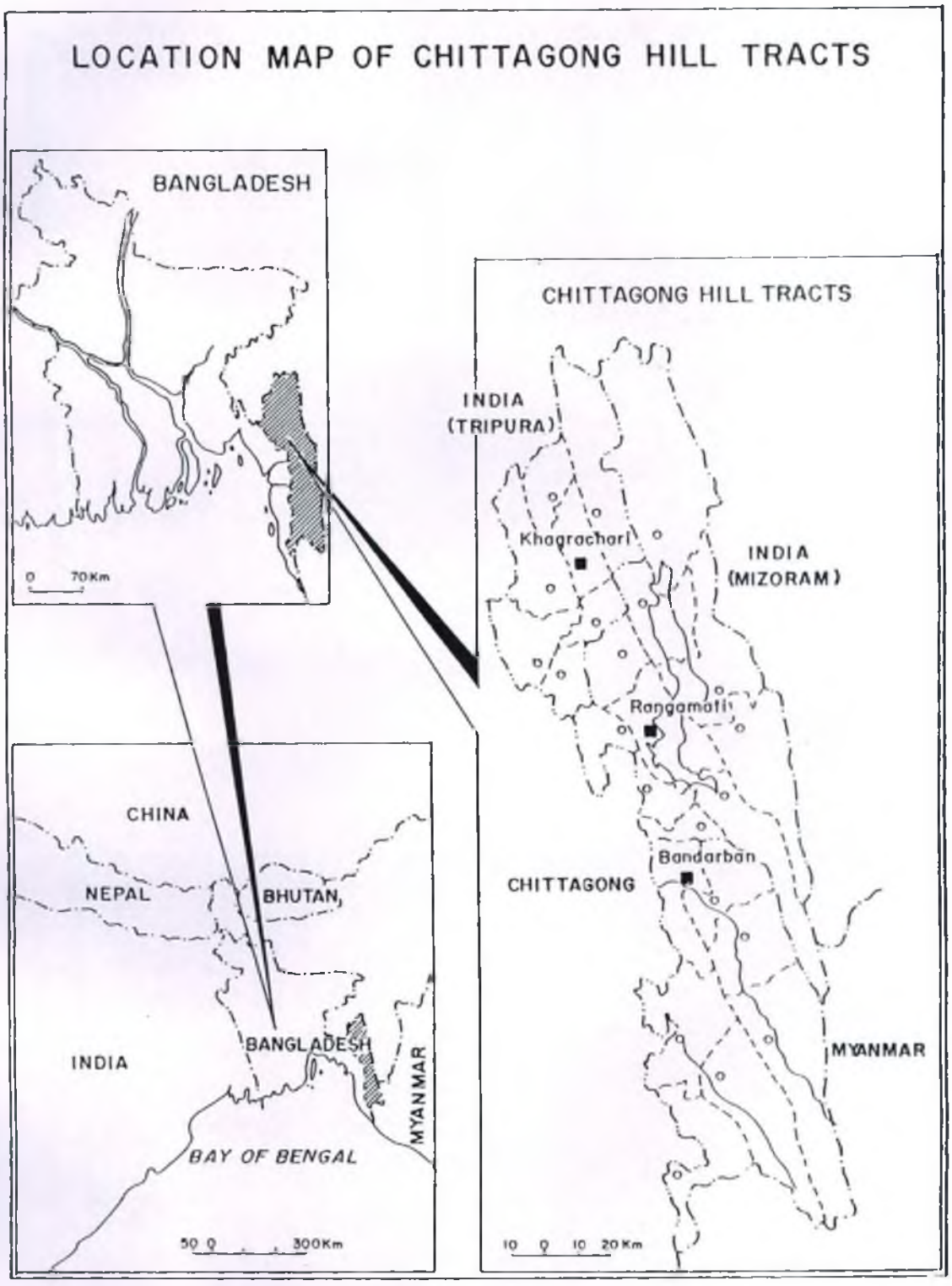






মানচিত্র-১

*Dhaka University Institutional Repository*

মানচিত্র-২

Dhaka University Institutional Repository

## প্রথম অধ্যায়

## জাতিগঠন প্রেক্ষিত

### উপক্রমণিকা

পৃথিবী প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্প, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান সবকিছুতেই একটি পরিবর্তনের হাওয়া এসে গেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনীতিতেও এই পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। উপনিবেশিক শাসনের বিপর্যয়ের পর এবং সফল জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে নতুন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং পুরানো রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এই জাতীয় পরিবর্তন যে বিশ্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরীখে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে তা আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তারও বাইরে। নতুন ধারার এই পরিবর্তনের ফলে তা বিশ্লেষণের জন্য পুরাতন পদ্ধতিসমূহও পরিবর্তিত হচ্ছে। নিত্য নতুন আবিস্কারের ফলে এই সমস্যাগুলোর বহুমুখীতা, বৈচিত্র্যতা ও জটিলতার মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতিগুলো নুতন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। উপনিবেশবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ। বিভিন্নমুখী গোষ্ঠীগুলিকে একটি জাতীয় ব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধ করা।[১] একটি জাতিগঠন তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে জাতিসত্তার উপলব্ধি ও অভেদ জাতীয়তার ভিত্তি নির্মাণ।[২] সঠিক জাতীয় সংহতি অর্জনের অন্যতম দিক হচ্ছে জাতিসত্তা নিধারণ ও জাতি পরিচিতি সংকটের সমাধান।[৩] উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতিগঠন ও সংহতি অর্জনের সবচেয়ে মৌলিক ও প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, জাতিসত্তার প্রশ্নটির সুষ্ঠু মীমাংসা।[৪]

---

১. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration.* Columbia University Press, 1972, pp. 2-3. এবং আরও দেখুন M. Nazrul Islam, "Bangladesh" in J.C. Johari, et. al., *Government and Politics of South Asia,* Sterling Publishers Ltd. New Delhi 1989.

২. Lucian W. Pye, "Identity and political culture" in Binder et. al. *Crisis and Sequences in political development,* Princeton N. J. Princeton University Press, 1972, pp. 73-74

৩. Lucian W. pye, *Aspects of political Development* Boston, little, Brown and Company (Inc.) 1966 p. 63.

৪. C.W. Welch Jr. (ed.) *Political Mordernization, A Reader in the comparative change* California, Duxbury Press, 1971, p. 168.

Dhaka University Institutional Repository



## ১.২ জাতিগঠন : বিশ্ব প্রেক্ষিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় বেশ কিছু স্বাধীন দেশের উদ্ভব হয়। এই সকল নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের 'বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থা'।[৫] বহুত্ববাদী সমাজকে রাজনৈতিক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। উপনিবেশিক শাসনের বিলুপ্তি শুরু হওয়ার পর এই সব দেশগুলোর অধিকাংশতেই সে সব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক বা একাধিক গোষ্ঠীর অনানুগত্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই গোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর অংশগ্রহণ, অধিকতর স্বায়ত্ব শাসন অথবা বিচ্ছিন্নতার দাবী করে।[৬] এই সকল নতুন দেশগুলোতে ভূখণ্ডগত সীমানা নিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরোধ এবং পরিণামে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে তা মূলতঃ উপনিবেশিক শাসনেরই ফলশ্রুতি।[৭] উপনিবেশিক প্রশাসন একটি জাতিকে অস্তিত্বমান করার জন্য তথা বহুমুখী জাতীয়তাকে একটি সংহতরূপ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগায়নি।[৮]

উপনিবেশবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উপনিবেশিক প্রভূরা "বিভক্ত কর ও শাসন কর" (divide & rule) নীতি গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের শাসনাধীন ভূ-খন্ডের বহুবচনিক গোষ্ঠী ও বহুবচনিক সংস্কৃতি অনুসারী জনগোষ্ঠীর মধ্যকার তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করতে চেয়েছে। জাতীয়তার প্রতি জনগণের আনুগত্যের ব্যাপারে শাসন কর্তৃপক্ষের তেমন একটি আগ্রহ ছিলনা; পক্ষান্তরে তারা এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি করে যারা তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।[৯] উপনিবেশিক শাসকরা জাতীয় আনুগত্যের বিকাশকে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে গণ্য করতেন। সবধরণের গোষ্ঠীতান্ত্রিক সম্পর্ক বা উপজাতি বা গোষ্ঠীকে (যেমন: নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত, আঞ্চলিক, উপজাতিক ইত্যাদি) সতর্কতার সঙ্গে অবদমন করা হয়। এর ফলে দেশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে

---

৫. J.S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice* London, Cambridge University Press, 1948.

৬. Rounaq Jahan, "India, Pakistan and Bangladesh" in G Henderson, Richard N. Lebow and John G. stoessinger (eds.) *Divided Nations in a Divided world*, New York : David Mc kay Company, Inc. 1974, p. 299.

৭. R. Brissenden and J. Griffin (eds.) *Modern Asia : Problems and Politics*, Brisbane (Australia) : The Jacaranda Press, 1974, p. 1.

৮. B. N. Pandey, *South and South East Asia 1945-1979 : Problems and politics*, London : The Macmillan Press, Ltd. 1980, pp. 113-150.

৯. Myron Weiner, *Political Integration and Political Development*, the Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 358 (March 1965), p. 55.

Dhaka University Institutional Repository



মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[১০] এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের বিকাশ ছিল একটি নেতিবাচক ঘটনা। বস্তুত তা ছিল একটি ইতিবাচক, সংহত, জাতীয় পরিচিতির চাইতে অধিকতর মাত্রায় পাশ্চাত্য উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন।[১১]

এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রই উপনিবেশোত্তর বছরগুলোতে সবচেয়ে যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হচ্ছে জাতীয় সংহতি সমস্যা। 'যুগটি হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রের যুগ আর এখনও সমস্যাটি হচ্ছে জাতিগত সমস্যা'।[১২] বহু দেশেরই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী, পেশাজীবি, ধর্মীয় ও সামাজিক গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। অথচ এই সকল নতুন স্বাধীন দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের জাতীয় সংহতি গঠনের বিরাট দায়িত্বের বোঝা নিয়ে সমস্যায় পড়েন।

যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি বা পরপরই শিল্প ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয় এবং জাতি-রাষ্ট্রের উন্নয়নে অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে সেখানে এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন দেশগুলোতে বহুমুখী ও বিচিত্র ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নানা ধরনের আদর্শিক দ্বিধাদ্বন্দ্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করা হয়।[১৩]

ভৌগলিকভাবে তারা একটি জাতির মর্যাদা লাভ করলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, তারা কিভাবে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐক্য বজায় রাখবে এবং ঐ পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিচ্ছিন্ন গ্রুপগুলো থেকে কিভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করবে। অধিকন্তু ঐ কাঠামোর ভেতরেই অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দকে দু'টি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয় : প্রথমত, বিচ্ছিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর[১৪] মধ্যে কিভাবে জাতি- সত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করবে এবং দ্বিতীয়ত , উপনিবেশিক প্রশাসনের স্থলে কিভাবে একটি নতুন কেন্দ্রমুখী রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করবে। অবশ্য জাতিগঠন বা জাতীয় সংহতি সমস্যা কোন নতুন বিষয় নয় বা তা

---

১০. B. N. Pandey, *op. cit.*, p. 2.
১১. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*, *op. cit.*, p. 1.
১২. Abdur Razzaq, *Bangladesh state of the Nation*, University of Dacca, Bangladesh (January, 1981) p. 6.
১৩. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*, *op. cit.*, p. 1.
১৪. Lucian W. pye, *Aspects of political Development*, *op. cit.*, p. 65. এবং আরও দেখুন Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*, *op. cit.*, foot note no. 3.

Dhaka University Institutional Repository



কেবল এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন দেশগুলোর জন্যই প্রযোজ্য নয়। ইউরোপীয় দেশগুলোতেও এই সমস্যা আছে এবং বর্তমানে তারা একই ধরনের সংহতি সমস্যার মোকাবিলা করছে।[১৫]

অধিকন্তু উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশগুলোই এই সমস্যাটির মোকাবিলা করছে। উদাহরণ স্বরূপ বেলজিয়াম, কানাডা এবং চেকোশ্লোভাকিয়া রাজনৈতিকভাবে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে তাদের এক কেন্দ্রিক সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছে যা এক দীর্ঘকালীন সমস্যা হিসেবে বিরাজ করেছে।[১৬] অনুরূপভাবে গৃহযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণের ইতিহাসে আঞ্চলিকতাবাদ বজায় রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯৩৪ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল এবং এসময় পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যটি ফেডারেল কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল।[১৭] অন্য ভাষায় বলা যায়, "পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সামন্তবাদী বহুমুখীনতা থেকে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এবং পরে আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে বিকাশ লাভ করে; এজন্য তাদেরকে একই ধরনের বিভক্তি পারস্পরিক সন্দেহ এবং সংবদ্ধ সংহতিবোধ ও সম-অনুভূতির অভাব মোকাবিলা করতে হয়েছে।[১৮]

উন্নত দেশগুলো এই অর্থে সৌভাগ্যবান যে, তাদের একটি পূর্ব-অস্তিত্বমান ও সুসংহত জাতীয় আদর্শ, একটি জাতীয় এলিট এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। তাদের প্রধান সমস্যা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থায় এক বা একাধিক বহিরাগত গোষ্ঠিকে সংঘবদ্ধ করা। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এরূপ পূর্ব-অস্তিত্বমান সার্বভৌম ব্যবস্থার অভাব ছিল এবং তাদের সমস্যা ছিল দু'ধরনের : প্রথমত, একটি জাতীয় আদর্শ, একটি জাতীয় এলিট এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদি তথা একটি জাতি কিভাবে গঠন করা যায়; এবং দ্বিতীয়ত, বহুমুখীন গোষ্ঠীগুলোকে নব সৃষ্ট জাতীয় ব্যবস্থায় কিভাবে সংহত করা যায়।[১৯]

---

১৫. M. Nazrul Islam, *The Politics of National Integration in new States : A Comparative Study of Pakistan and Malaysia 1957-1970*, Ph.D. dissertation, Griffith University, Australia, 1984 and also see author's *Pakistan and Malaysia : A Comparative Study in National Integration*, Sterling Publishers Ltd. New Delhi 1989.

১৬. Roger Scott (ed.) *The Politics of New States : A General Analysis with Case Studies from Eastern Asia*, London: George Allen and unwin Ltd., 1970, p. 28.

১৭. R. Brissenden and J. Griffin (eds.) *Modern Asia : Problems and Politics*, op. cit. , p. 1.

১৮. Howard Wriggins, "National integration", in Myron Weiner (ed.), *Modernization : The Dynamics of Growth*, New York; Basic Books Inc. Publishers, 1966, pp. 185-186.

১৯. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*. Op. cit., pp.2-3.

Dhaka University Institutional Repository



জাতিগঠন সংক্রান্ত সমস্যার আবর্তে পড়ে উন্নত দেশগুলো নিজ নিজ দেশের শাসনতন্ত্রের আলোকে এই সমস্যার সমাধান করতে সফল হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৩ সালের নরওয়ে ও সুইডেনের ল্যাপ কার্ডিসিয়াল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল জাজমেন্ট ১৭৬৩ সালে কানাডার রাজকীয় ঘোষণা, ১৮৪০ সালের নিউজিল্যান্ডের ওয়েট্যাংগি চুক্তির কথা বলা যায়।[২০] কাজেই এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, জাতিসত্তার সঠিক পরিচয় উপলব্ধি ও বিনির্মাণ ছাড়া জাতিগঠন, জাতীয় সংহতি ও উন্নতির চিন্তা একান্তই অর্থহীন। একটি জাতির সত্তা যদি থাকে অস্পষ্ট বা বিতর্কিত তাহলে বাহ্যতঃ একটি জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে তার পরিচয় থাকলেও বিক্ষিপ্ততা, বিশ্লিষ্টতা ও নানা দ্বন্দ্ব জাতির চলার পথকে করে ব্যাহত। মাথা তুলে দাঁড়াতে জাতিটি প্রতিটি পদে পদে হয় বাধার সম্মুখীন। তাই এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদগণের নিকট জাতিগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নটি এতো গুরুত্বপূর্ণ।

### ১.৩ জাতিগঠন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিগত সমস্যার উৎপত্তি এবং জাতীয়তার প্রকৃতি নির্ধারণে সৃষ্ট জটিলতাব কারণে জাতিগঠন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই সমস্যার আবর্তে পড়ে সংহতির সংকটে নিমজ্জিত। প্রায় দু'শ বৎসর ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্থান নামক রাষ্ট্রের বৃন্ত থেকে ১৯৭১ সালে এক সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বেরিয়ে আসল বাংলাদেশ নামক এই নতুন রাষ্ট্রটি। স্বাধীনতার পরে রাষ্ট্রগঠনের পাশাপাশি জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও এই দীর্ঘ ২৬ বৎসর পরেও তা আশানুরূপ অগ্রগতি পায়নি। নতুন ভাবধারার মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রীয় রূপ প্রাপ্ত হলেও বাংলাদেশে এখনও উপনিবেশিক আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী ও আইনী কাঠামো সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান। উপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার হিসেবে শক্তিশালী প্রশাসনযন্ত্র লাভ সাপেক্ষে বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতিরাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করলেও দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ৫০৮৯ বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের অসন্তোষ রাষ্ট্রীয় সংহতিকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে রেখেছে।

আসলে অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত পরিধিতে জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের ভিত্তিতে জাতীয়তা যেভাবেই জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হোক না কেন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয়তার সমস্যা পৃথিবীর

---

২০. The Report of the Chittagong Hill Tracts Commission, May 1991, p. 10

Dhaka University Institutional Repository



বিভিন্ন দেশে কোন না কোন ভাবে থেকেই গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' ভেঙ্গে গেছে এবং প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করেছে। যুগোস্লাভিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে স্লাভ জাতীয়তাবাদী সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই নয়, অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেও এই সমস্যা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। কানাডার কুইবেকে, স্পেনের বাস্কু ও ক্যাটালোনিয়া এবং গ্রেট বৃটেনের উত্তর আয়ারল্যান্ডে এ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে।[২১] আফ্রিকাতে বিভিন্ন জাতি বা জাতিসত্তার মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ বহুদিন থেকেই অব্যাহত। যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজ সহ ইউরোপীয়রা রেড ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংস করে দিয়ে আজকে এক শংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই জাতিসত্তা সমস্যা রয়েছে।[২২] মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দীদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ইরান, ইরাক, ও তুরস্কে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিব্যাপ্ত। কুর্দীরা স্বাধীন কুর্দীস্থানের জন্য ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। রুমানিয়ার হাঙ্গেরীয়, যুগোস্লাভের আলবেনীয়, বুলগেরিয়ার তুর্কী সংখ্যালঘুদের ও তিব্বতীদের জাতীয়তাবাদী চেতনা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সংহতিকে বিনষ্ট করার হুমকী স্বরূপ। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের পাঞ্জাব, কাশ্মীর সহ পূর্বাঞ্চলীয় 'সাতবোন রাজ্যে' জাতিসত্তাগত সমস্যা প্রকট।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় এই পাহাড়ী এলাকার উপজাতি নাগরিকদের সংস্কৃতি, জীবনধারা, ভাব প্রকাশের ভাষা ও উৎপাদন পদ্ধতি সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে পৃথক। তারা ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় বিভক্ত হলেও নিজেদের জীবন পদ্ধতির ধারার মধ্যেই যথাসম্ভব আধুনিক জীবনকে আলিঙ্গন করতে চায়। তারা আধুনিক শিক্ষা ও উন্নয়নের বিরোধী নন। কিন্তু কতকগুলো প্রাচীন বিশ্বাসের উপর আস্থাশীল। এই জাতীয় বিশ্বাস থেকে তারা নিজেদের সভ্যতার মূল চরিত্রকে রক্ষা করতে চান। সে কারণে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও আঞ্চলিকভাবে তারা স্ব স্ব জাতীয় সত্তাকে বিলুপ্ত করার বিরুদ্ধে প্রায়ই রুখে দাঁড়ান।[২৩] বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় উপজাতীয়রা এতই ক্ষুদ্র যে, তাদের অস্তিত্ব জাতীয় পরিধিতে খুবই নগন্য। একারণে তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সংরক্ষণের সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা কম থাকায় এবং

---

২১. ফেরদৌস হোসেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা", *প্রবন্ধাবলী-৩*, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৯৮।

২২. ফয়েজ আহমদ, "পার্বত্য এলাকার জটিল পরিস্থিতির অবসান প্রচেষ্টা দীর্ঘায়িত হতেপারে", (*দৈনিক ভোরের কাগজ*, ঢাকা ১৪ই মে, ১৯৯৭)

২৩. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository



অনেকাংশে সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা ধরে রাখার কারণে তারা নিজস্ব পরিধির মধ্যেই বাঁধা পড়ে আছে। ফলে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পরিসরে মূল স্রোতধারা হতে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন; যদিও তাদের এই বিচ্ছিন্নতা প্রধানতঃ অবস্থানগত বাস্তবতা হতে সৃষ্ট। বাংলাদেশ সংবিধানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সত্তার প্রশ্নটি অস্পষ্ট এবং সংবিধানে অব্যক্ত।[২৪] ফলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধিতে আত্মনিয়ন্ত্রনের সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের এই সংগ্রাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে প্রকট সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই এই সমস্যার গুরুত্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির সাথে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে। কিন্তু প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এটাকে অসাংবিধানিক হিসেবে আখ্যায়িত করে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ফলে সমস্যার সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। উত্তরোত্তর এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে পড়ছে। তাই এ বিষয়টি সামাজিকবিজ্ঞানী তথা রাজনৈতিক নৃ-বিজ্ঞানী ও উপজাতি সম্পর্কিত গবেষকগণের কাছে নি:সন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ট অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আলোচ্য গবেষণায় আমরা এ বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করবো।

---

২৪. ফেরদৌস হোসেন, *op. cit.*

Dhaka University Institutional Repository

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# জাতিগঠন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

### ২.১ জাতিগঠন ও জাতীয় সংহতি

জাতিগঠন এবং জাতীয় সংহতি পরিভাষা দু'টি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

'In the current literature the term 'nation building' is most often used Interchangeably with 'National integration.'[১]

Oxford English Dictionary সংহতির সংজ্ঞায় বলেছে "..... to integrate is to put or bring together (parts or elements) so as to form one whole; to Combine in a whole."[২]

এসম্যানের কথায়, জাতিগঠন হল "এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুপরিকল্পিত উপায়ে এক সুসমন্বিত রাজনৈতিক সম্প্রদায় সংগঠন করা যেখানে জাতীয় রাষ্ট্রই হচ্ছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।" (The deliberate fashioning of an integrated political community within fixed geographic boundaries in which the nation state is the dominant political institution.)[৩] উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতিগঠন হচ্ছে অন্যতম জটিল সমস্যা, কেননা অধিকাংশই "এখনও জাতিতে রূপান্তরিত হয়নি যদিও তারা জাতিগঠন সম্পর্কে আশান্বিত।"[৪]

জাতিগঠন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর শুরু আছে, নেই কোনো সমাপ্তি। এটি ক্রমবর্ধমান ধারায় পরিপূর্ণতা অর্জন করে। তাছাড়া জাতিগঠন হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক (Multidimensional) সমস্যা।[৫] জাতিগঠন বলতে অনেক সময় জাতীয় সংহতি বুঝায়।

---

১. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration.* Oxford University Press, Bangladesh Edition, 1973, p. 3.

২. The Oxford English Dictionary, Vol. V, H-K, London: Oxford University Press, 1933, p. 367.

৩. Milton J. Esman, "The Politics of Development Administration" in John D. Montgomery and William J. Siffin, (eds.) *Approaches to Development: Politics, Administration and Change*, New York: 1966, pp. 59-60.

৪. Rupert Emerson, *From Empire to Nation*, Boston: Beacon Press, 1960, p. 94.

৫. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৫

Dhaka University Institutional Repository



## ২.২ জাতীয় সংহতির তত্ত্বগত ধারণা

জাতীয় সংহতির ধারণা বস্তুতঃ বহুমুখীন। কোন সাধারণ সংজ্ঞা দিয়ে এর কোনো একটি দিককে বুঝানো যায়।[৬] বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিকগণ বিভিন্ন ভাবে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। আর্নেষ্ট বি. হাস (Ernest B. Hass) সংহতির সংজ্ঞায় বলেছেন, "Process whereby political actors in several distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities toward a new centre, whose institutions process or demand. Jurisdiction over the Pre-existing national states."[৭]

Lucian w. pye সংহতি সম্পর্কে বলেছেন, ".....the extent to which the entire polity is organised as a system of interacting relationships, first among the offices and agencies of government, and then among the various groups and interest seeking to make demands upon the system, and finally in the relationships between officials and articulating citizens."[৮]

জাতীয় সংহতি আধুনিকীকরণের একটি দিক মাত্র।[৯] জাতীয় সংহতি একটি সমাজের বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলোকে একটি অধিকতর সামগ্রিকতায় সংহত করে, অথবা বহু ধরণের ক্ষুদ্র ও বিভিন্নমুখী সমাজকে এক জাতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।[১০] Amitai Etzioni সংহতির সংজ্ঞায় বলেছেন, জাতীয় সংহতি হচ্ছে, "অভ্যন্তরীণ ও বাইরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করায় একটি ইউনিট বা ব্যবস্থার সক্ষমতা।" ("the ability of a unit or system to maintain itself in the face of internal and external challenges)"[১১]

---

৬. Leonard Binder, *National Integration and Political Development*, American Political Science Review, Vol. LVIII, No. 3 (September 1964) p. 622.

৭. Ernest B. Hass, *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957*, California: Stanford University Press, 1958, p. 16.

৮. Lucian W. pye, *Aspects of political Development*, Boston, little, Brown and Company (Inc.) 1966, p. 63.

৯. D. A. Rustow, "A World of Nations: Problems of Political Modernization", Washington: The Brookings institution, 1967, pp. 1-31 and Myron Weiner (ed.), *Modernization : The Dynamics of Growth*, New York; Basic Books Inc. Publishers 1966, pp. 1-52.

১০. Howard Wriggins, "National integration", in Myron Weiner (ed.), *Modernization : The Dynamics of Growth*, New York; Basic Books Inc. Publishers, 1966, pp. 181-191.

১১. Amitai Etzioni, *Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965, p. 330

Dhaka University Institutional Repository



এই সংজ্ঞা অনুসারে সংহতি হচ্ছে পৃথক পৃথক অংশ গুলোকে একত্রিত করা; পৃথক অংশ গুলোকে আত্মব্যবস্থাগত ও যথোপযুক্ত ক্ষমতাসহ একটি সম্প্রীতিপূর্ণ স্বাধীনসত্তায় একত্রিত করা।[১২] Amitai Etzioni আরও বলেন, এটি হচ্ছে একটি শর্ত যাতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, পুরস্কার এবং শাস্তিদানের সামর্থ এবং পরিচিতির ক্ষেত্র সদস্য ইউনিট থেকে সাধারণ ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়।[১৩] 'জাতীয় সংহতি' পদবাচ্যটির যান্ত্রিক (mechanistic) এবং অনুরূপভাবে স্বতঃস্ফূর্ত দিক (Facet) রয়েছে। K.W. Deutsch এর মতে, জাতীয় সংহতি- "..... একটি স্থাপত্যগত বা যান্ত্রিক মডেল। একটি বাড়ী, কাঠ, ইট বা মাটির দ্বারা বিভিন্ন নকশায়, দ্রুত অথবা ধীরে, বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে, তার গঠনে আংশিক স্বাধীনতা এবং নির্মাতার পছন্দ, ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নির্মাণ করা যায়। তেমনি একটি জাতি ও বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন উপাদান থেকে দ্রুত বা ক্রমাগত, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এবং তার পরিবেশ থেকে আংশিক স্বাধীনতায় গঠন করা যেতে পারে।" [১৪]

মোট কথা, 'সংহতি' পদবাচ্যটি বস্তুগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত এবং তা মানব শরীরের শারীরিক সংহতি। শিক্ষা, ভাষা, আইনব্যবস্থা বা সাহিত্য ক্ষেত্রের সামাজিক সংহতি[১৫] থেকে অনুন্নত ও উন্নত সমাজের অর্থনৈতিক সংহতি এবং একটি দেশের আদিবাসীদেরকে একটি জাতীয় সম্প্রদায়ে সংহতি প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত সম্প্রসারিত।[১৬] জাতিসত্তার প্রশ্নটির সঙ্গে কতকগুলো মুখ্য উপাদান নিহিত রয়েছে যেগুলোর সমন্বয়েই মূলতঃ জাতিসত্তার স্বরূপটি নির্ধারিত হয়। যে উপাদানগুলোর বিকাশের উপরই নির্ভর করে জাতিসত্তার পুষ্টি ও বিকাশ। যে সমস্ত উপাদান একটি জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা নির্ধারণে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে চারটি দিক হচ্ছে প্রধান; (১) প্রাকৃতিক বা দেশজ দিক (২) ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত দিক (৩) ধর্মীয় ও আদর্শিক দিক এবং (৪) আন্তর্জাতিক দিক। কেউ কেউ জাতিগঠন ও জাতিসত্তার উপাদান হিসেবে সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সংগঠনকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

১২. Boon-Ngee Cham, *Toward and Malaysian Malaysia: A Study of Politica l integration.* Ph.D. thesis. The University of Alberta, Canada, Spring 1971, pp. 1-31.

১৩. Amitai Etzioni, *op. cit.*, p. 4

১৪. Karl W. Deutsch and William J. Foltz (eds.), *Nation-Building*, New York Atherton Press, 1963, p. 3.

১৫. Nick Aaron Ford, *Cultural Integration Through Literature*, Teachers College Record, Vol. 66. No. 4, January 1965, pp. 332-337.

১৬. Boon-Ngee Cham, *op. cit.*, p. 3.

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতি এমন একটি বিষয় যা দেশজ উপাদান, ধর্ম, আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সংগঠনও মূলতঃ সমাজের আদর্শ, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল।[১৭]

পাশ্চাত্যে 'এক ভাষা এক কৃষ্টি' জাতিগঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু নতুন দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়েছে ভিন্নমুখী সামাজিক সাংস্কৃতিক ভূমিতে[১৮] আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি ও ভাষার বিভিন্নতা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি কল্পে কার্যকর হয়নি। বিভিন্ন কৃলভিত্তিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক গ্রুপ বা গোষ্ঠী বিদ্যমান রয়েছে এসব নতুন রাষ্ট্রে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বহুজাতীয় ও বহুগোষ্ঠীর সমস্যা। রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান গ্রুপ বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে যুদ্ধ ও সংঘাত তা একদিকে যেমন স্তরভিত্তিক (vertical), যেমন - শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে তেমনি আনুভূমিক (horizontal) যেমন, বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক গ্রুপের মধ্যে সংঘাত। এসব সমাজে অধিকাংশ জনগণের আনুগত্য জড়িত রয়েছে ক্ষুদ্রতর প্রত্যক্ষ এককের প্রতি বৃহত্তর একক রাষ্ট্রের প্রতি নয়।[১৯]

সমগ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত সংহতির ধারণাটির সংজ্ঞাদান করা কঠিন। কারণ তাদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংকটাবর্তে পতিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বিত সমস্যাগুলিকে বোঝার জন্যে অধিকাংশ সমাজের ক্ষেত্রে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মানব সম্পর্ক হিসেবে সংহতি হচ্ছে কোন কিছু করার ক্ষেত্রে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় প্রয়াস বা একটি বিশেষ পন্থায় বাইরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার এক ধরনের সম্পর্ক, যা ঐক্য বা সম্প্রীতির এক বিশেষ মর্যাদাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।" [২০]

দ্বিতীয়তঃ "সংহতি বলতে সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি জাতীয় পরিচিতি প্রতিষ্ঠাকে বুঝায়। যদিও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিই চূড়ান্তভাবে জড়িত থাকে। তথাপি জাতীয়

---

১৭. আহমদ আবদুল কাদের, "আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ", মাহবুবুর রহমান মোরশেদ সম্পাদিত *মানব উন্নয়ন জার্ণাল*, বর্ষ ২; সংখ্যা ১; মার্চ, ১৯৮৯, ঢাকা-১০০০

১৮. John H. Kautsky, (ed.) *Political Change in Underdeveloped Countries*, New York : Wiley, 1962, p. 33.

১৯. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, op. cit., পৃষ্ঠা ৪

২০. Boon-Ngee Cham, op. cit., p. 8.

Dhaka University Institutional Repository



বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি অতিরিক্ত গতিধারাও থাকে এবং এই পর্যায়েই ইতোমধ্যে সংহত" (already integrated)[২১] গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ "বিশ্বে নিখুঁত সংহতিসম্পন্ন সমাজ নেই বললেই চলে।[২২] একটি বিশেষ পর্যায়ে একটি বিশেষ সংহতি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে পরবর্তী পর্যায়ে নতুন সংহতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংহতি অবশ্যই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য মৌল চাহিদা। এছাড়া যে সমাজে পর্যাপ্ত সংহতি অর্জিত হয়েছে সেখানে প্রযুক্তিগত আধুনিকতা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, যাতে সংহতির জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে।[২৩] একটি সমাজের প্রতিটি লোকই একটি অভিন্ন সামাজিকীকরণের আওতাভুক্ত নয় এবং তাদের মতামত ও একরকম নয়। তাই সকল সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ মাত্রার বিভিন্নতা রয়েছে।[২৪]

শেষতঃ সংহতির ধারণা একটি অন্যতম প্রক্রিয়া এবং তার দু'টো সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। Samuel P. Huntington- এর মতে, "National integration is a Phenomenon as much as National disintegration."[২৫] অবশ্য অধিকাংশ উন্নয়নশীল এলাকার সংহতিবদ্ধ বিপ্লবের জন্য রক্ত, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, স্থান, ঐতিহ্য, গোত্র বা সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক আদি মানসিকতা দূর করার মাধ্যমে একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের লক্ষ্যে আবেদন জানানো হয়। এই সকল উন্নয়নশীল সমাজ গুলোতে সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর সংহতির চেয়ে সাম্প্রদায়িক সংহতির পুনঃসংযোজন ও সম্প্রসারণ।

অন্যান্য পণ্ডিতরা জাতীয় সংহতি বলতে একটি পরিচালন ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। যাতে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী অভিন্ন স্বার্থের অংশীদার হয়। অথবা যাতে ব্যক্তির আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিশেষ জাতীয় অবস্থা

---

২১. Philip E. Jacob and Henry Teune, "The Integrative Process: Guidelines for Analysis of the Bases of Political Community" in Philip Jacob and James Toscano (eds.) *The Integration of Political Communities*, New York; J. B. Lippincott Co., 1964, p. 9.

২২. Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Houghton Mifflin Co., 1964, p. 159.

২৩. A. F. K. Organski, *The Stages of Political Development*, New York : Knopf, 1965.

২৪. M. Nazrul Islam, *Problems of Nation Building in Developing Countries: The Case of Malaysia*, University of Dhaka, 1988, p. 18.

২৫. Samuel P. Huntington, *Political Development and Political Decay*, World Politics, Vol. 17, No. 3, April 1965, p. 392.

Dhaka University Institutional Repository



থেকে একটি নতুন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বা গোত্রীয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী থেকে একটি নতুন জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি স্থানান্তরিত হয়।[২৬]

Myron Weiner এর মতে সংহতির সঙ্গে ৫টি মৌলিক দায়িত্ব জড়িত। সেগুলো হচ্ছে:-

ক) ভৌগলিক জাতীয়তার ধারণা সৃষ্টি (creation of a sense of territorial Nationality)

খ) একটি জাতীয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা (establishment of National authority)

গ) একটি মূল্যবোধগত নূন্যতর্ম মতৈক্য সৃষ্টি (creation of the minimum value consensus)

ঘ) এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধন; (elimination of the mass- elite gap) এবং

ঙ) সংহতি প্রতিষ্ঠান ও আচরণের রূপরেখা প্রণয়ন (building of interactive institutions)[২৭]

এখানে জাতীয় সংহতি বলতে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের কথা বলা হয়েছে। যাতে সকল প্রকার আঞ্চলিক উপ-ব্যবস্থাকে পরিহার বা সার্বিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।[২৮]

সুতরাং 'সংহতি' বলতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আনুগত্যের মধ্যকার সংহতি থেকে মানব সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গীর এক ব্যাপকতর সম্প্রসারণ, জাতীয় চেতনার উন্নয়ন; একটি অভিন্ন ভৌগলিক কাঠামোতে ক্ষমতা প্রয়োগকারী সরকার সম্বলিত রাজনৈতিক ইউনিটগুলোর সংহতি, শাসক ও শাসিতের সংহতি এবং একটি অভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অধীনে নাগরিকদের সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যক্তিদেরকে একটি সংগঠনের সঙ্গে সংহতিবদ্ধ করাকে বুঝায়।[২৯] উদাহরণ স্বরূপ Maurice M. Raumani এর মত অনুসারে সংহতি মানে বিভিন্ন শক্তির ঘনিষ্ট, সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা যা বিশেষ কোন ইউনিটকে সুষ্ঠু পরিচালনায় সক্ষম করে তোলে।[৩০] এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখক সংহতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যেয়ে বিভিন্ন ধরনের সংহতির ধারণা পোষণ করেন। এর কারণ হচ্ছে প্রত্যেক লেখক মাত্র একটি বা ততোধিক বিশেষ সমাজের সঙ্গে পরিচিত এবং তারা 'একটি সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিচালনায় সাধারণ সমস্যার' একটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা

---

২৬. Amitai Etzioni, *op. cit.*, p.6

২৭. Myron Weiner, *Political Integration and Political Development*, the Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 358, March, 1965, p.52.

২৮. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*. New York: Columbia University Press, 1972, p. 3.

২৯. Myron Weiner, *op. cit.*, p. 54.

৩০. Maurice M. Roumani, *National Integration-A Conceptual Frame Work Plural Societies*, Vol. 9, No. 2 and 3, (Summer/Autumn 1978), p. 26.

Dhaka University Institutional Repository



করেন।[৩১] তারা হয় গোষ্ঠীগত বহুমুখীনতা অথবা গোষ্ঠীগত পরিচিতির বিষয়টিকে বাহ্যিকভাবে নিছক রাষ্ট্রীয় সংহতির কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করেন।[৩২]

বাংলাদেশের জাতিগঠন সংক্রান্ত সমস্যায় উপরোক্ত আলোচনার প্রতিফলন পরিদৃষ্ট। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিরাজমান রাজনৈতিক অসন্তোষ জাতীয় সংহতি ও দেশগঠনে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। কখনও যদিওবা এই সমস্যা সমাধানে আশার আলো দেখা যায় পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতভেদের কারণে কিংবা আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে সেই আশার আলোতে দুরাশার কালোমেঘ জমাট বেঁধে যায়। এভাবেই বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়া বিভিন্ন আবর্তের মধ্যে পড়ে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে সম্মুখপানে। আর এই জাতীয় সংহতির সংকটে দেশের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয় এবং দেশের রাজনীতি হয়ে পরে অস্থিতিশীল।

---

৩১. Myron Weiner, *op. cit.*, p. 55.

৩২. Walker Couner, *Nation Building or Nation Destroying*, World Politics Vol. XXIV No. 3, April, 1972, p. 19.

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

# বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যার প্রকৃতি

## ৩.১ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার হরণ এবং ভঙ্গুর জাতিগঠন কার্যক্রম

বাংলাদেশে ধর্ম হচ্ছে শক্তিশালী ফাটল সমূহের অন্যতম প্রধান উৎস।[১] দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উপজাতিদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এ দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ শতাংশ[২] নিয়ে হিন্দুরা সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু হিসেবে অবস্থান করছে। যদিও তারা সকলেই 'বাঙালী' জাতি তবুও ধর্মীয় পার্থক্যতায় ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক এবং নির্বাচনী পরিচিতিতে ভিন্ন।[৩] হিন্দু ও মুসলমান এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরানো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পরস্পর অবিশ্বাস জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় শক্তভাবে অকার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।[৪] যদিও বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে তবুও কখনও কখনও সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে জাতিগঠন প্রক্রিয়া কঠিনভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সাধারনত মাইনোরিটি দু'রকমের হয়ে থাকে; রিলিজিয়াস মাইনোরিটি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু) এবং এথনিক বা কালচারাল মাইনোরিটি (জাতিগত সংখ্যালঘু)। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলতে মুসলিম বাদে অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু বোঝায়। আর জাতিগত সংখ্যালঘু বলতে আদিবাসী উপজাতি, বিহারী ইত্যাদি বুঝায়।

বাংলাদেশে প্রায় সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘুই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।[৫] হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় প্রতিনিয়ত। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হচ্ছে কারণ চাকমাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। কিছু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীও আক্রান্ত হচ্ছে। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ও সম্প্রতি হামলার শিকার হয়েছে।

---

১. Iftekharuzzaman & Mahbubur Rahman, "Nation Building in Bangladesh: Perceptions, Problems and an Approach" in M. Abdul hafiz and Abdur Rab Khan edited *Nation Building in Bangladesh retrospect and prospect*, BIISS, Dhaka 1986, p. 16.

২. The share of Hindu Community in the total population of Bangladesh was 33% in 1901, 28% in 1941, 22% in 1951, 18.5% in 1961, 13.5% in 1974 which came down to 12.1% in 1982, see, Statistical Year book of Bangladesh 1982, p. 91.

৩. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and issues*, UPL, Dhaka, 1987, pp. 161-162.

৪. Talukder Maniruzzaman, *Group Interests and Political Change*, Studies of Pakistan and Bangladesh, New Delhi: South Asia Publishers, 1982, p. 217.

৫. সাপ্তাহিক *যায় যায় দিন* (ঢাকা, ২২শে জুন, ১৯৯৩ সংখ্যা)

Dhaka University Institutional Repository



'৯২ এর ডিসেম্বরে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটেছে ক্ষমতাসীন সরকার সেটা স্বীকার করেনি। পুলিশ দাঙ্গাপীড়িত জেলাগুলোতে হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির মামলা গ্রহণেও অস্বীকার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। মৌলবাদের উত্থানের ফলে উত্তরোত্তর মানুষের অধিকার লংঘিত হচ্ছে। এতে নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বেশী।[৬]

অর্পিত সম্পত্তি আইনে বলা আছে- হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অন্য কোন দেশে গিয়ে বসবাস করে তবে তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু মুসলিম, খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যদি ভারত, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহলেও তাদের সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবেনা। এই আইনটি বলবৎ রাখা হয়েছে একটিমাত্র সম্প্রদায়ের মানুষকে তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য। এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী আইন বলে বিশেষজ্ঞগন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৭]

অর্পিত সম্পত্তি আইনের ফলে ১৯৬৪-১৯৯১ সালে ৫৩ লক্ষ হিন্দু দেশ ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৫৩৮ জন দেশত্যাগ করেছে। কিন্তু ১৯৬৪-১৯৭১ এ গড়ে প্রতিদিন ৭০৩ জন দেশত্যাগ করেছে। ১০,৪৮,৩৯০টি হিন্দুপরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১০ লক্ষ ৫ হাজার একর জমি তারা হারিয়েছে। দেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৩০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রতি ৩৪ টি পরিবারের মধ্যে ১০টি পরিবার এই অর্পিত সম্পত্তি আইনদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৮] এই আইনের দ্বারা ধনীচাষীরা উপকৃত হয়েছে সব চেয়ে বেশী ৫৩%, মধ্যম শ্রেণীর চাষীরা হয়েছে ২১% আর ভূমিহীন হয়েছে মাত্র ৩%। গ্রামের মাতব্বররা দখল করেছে ৬৭%, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ২%, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা করেছে ৫% বাদ বাকী অন্যান্যরা। রাজনৈতিক দলভিত্তিক ভাবে এই আইনের দ্বারা উপকৃত হয়েছে; বিএনপি ৭১.৬, আওয়ামী লীগ ১১.১, জাতীয় পার্টি ৪.৯, জামায়াত ৩.৭, মুসলীম লীগ ১.২, বাসদ ১.২ বাদবাকী অন্যান্যরা।[৯]

---

৬. *Ibid.*
৭. *Ibid.*
৮. Dr. Abul Barakat, Dr. Safiq Uzzaman, Dr. Azizur Rahman and Dr. Abhijit Poddar, *Political Economy of the vested property Act in Rural Bangladesh*, Association For Land Reform And Development (A.L.R.D.), Dhaka, 1997, pp. 1-22.
৯. *Ibid.*, pp. 81-83.

Dhaka University Institutional Repository



সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন বলেছেন- এই আইন সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক, জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি বিরোধী, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিরোধী কালোআইন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমদ বলেছেন 'এই আইন সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং প্রশাসনকে কলুষিত করেছে।'[১০]

এই আইন দ্বারা শুধু হিন্দু সংখ্যালঘুরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নয় বরং এরদ্বারা খৃষ্টান সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমবেশী বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১১]

১৯৮৮ সালের ৭ই জুন সংসদে গৃহীত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের একটি কথা শোনা যেতে থাকে। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলো 'বঙ্গভূমি' ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতবিরোধী ও প্রচ্ছন্ন হিন্দুবিরোধী প্রচার চালায়।[১২] এতে করে আবার জাতিগঠন প্রক্রিয়া সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ধুম্রজালের দোলায় দুলে ব্যাহত হতে থাকে। *দৈনিক দিনকাল* পত্রিকার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বঙ্গভূমি আন্দোলনে তিনটি সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে। 'বাংলা লিবারেশান অর্গানাইজেশন' (বি.এল.ও), 'বঙ্গসেনা' এবং 'লিবারেশন টাইগার্স অব বেঙ্গল' (বি. এল. টি.)। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি জেলাকে নিয়ে গঠিত কল্পিত বঙ্গভূমির মুক্তির জন্য যে অস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয় তার রয়েছে দুটো দিক। একটি অংশকে শেখানো হচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে হবে। অন্য অংশকে দেয়া হচ্ছে মিলিটারী ট্রেনিং এবং এই ট্রেনিং এর দায়িত্বে রয়েছে ভারতের আনন্দমার্গ, বাংলাদেশের শান্তিবাহিনী এবং একটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।[১৩]

১৯৮৮ সালের ৬ ই ডিসেম্বর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে হঠাৎ করে গ্রেফতার করার ঘটনার মাধ্যমে এবং সরকারী ও সরকার বহির্ভূত সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির এতদসংক্রান্ত বক্তৃতা বিবৃতিতে বিষয়টি সরকারী গুরুত্ব লাভ করে। পরে আবার সরকারী ভাবেই বলা হয়, এই তথাকথিত আন্দোলনের অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। ভারতের কিছু উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি এমন চিন্তা ধারার পোষক। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিআই) ও সিপিআই (এম) সহ ভারতের প্রগতিশীল রাজনৈতিক অংশ থেকে এর তীব্র সমালোচনা

---

১০. ডেনীস দিলীপ দত্ত, *স্বর্গমর্ত* (ঢাকা ১-১৫ মে, ১৯৯৭ ইং ১৩৭ সংখ্যা)

১১. *Ibid.*

১২. ডা. দিলীপ দে সম্পাদিত, *গ্লানি (The Disgrace)*, গ্লানি প্রকাশনা পরিষদ, চট্টগ্রাম, আগষ্ট, ১৯৯২

১৩. শেখ নুরুল ইসলাম, "তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন : বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী" *দৈনিক দিনকাল*, (ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যা)

Dhaka University Institutional Repository



এসেছে। এমনকি জাতীয় কংগ্রেসও এধরনের আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছে। এদেশে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বঙ্গভূমি আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে সরকারের পক্ষ থেকেও আর কোন উচ্চবাচ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।[১৪]

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩ সালকে 'আন্তজার্তিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বর্ষ' (International year of the world`s Indigenous people) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। পৃথিবীর বেশ কয়েকটি সংগঠন, জাতিসংঘের মানবাধিকার ও সমাজউন্নয়ন বিষয়ক সংস্থাসমূহ এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের আগ্রহের ফলেই জাতিসংঘ এই ঘোষণাটি দিয়েছিল। বিশ্বের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সে সব সমস্যার সমাধান করাই এই বর্ষ পালনের মূল উদ্দেশ্য। *Indigenous people - A New Partnership.* এটিই ছিল এবছরের শ্লোগান। অন্যান্য যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে তা হল : সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগীতা বৃদ্ধি, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রভাবিত করে এমন সব উন্নয়ন প্রকল্পে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।[১৫]

অথচ এ সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতরের পরিচালক (জাতিসংঘ) স্বাক্ষরিত ২৭শে জুলাই '৯২ তারিখের একটি চিঠি স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের সচিবের কাছে পাঠানো হয়। চিঠির সূত্র- স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগের স্মারক নং এস এবি(সম)- ১৪/৯২/৪৭৯ তারিখ ৭-৫-৯২ এবং এস এবি (সম)- ১৪/৯২/৫৫৯ তারিখ ৩-৬-৯২ বিষয় : ১৯৯৩ সালকে বিশ্ব 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠীর জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে উদযাপন। বর্ষ উদযাপনের আহবান জানিয়েছে জাতিসংঘ। কিন্তু উল্লিখিত চিঠি দ্বারা 'প্রস্তাবিত বর্ষ উদযাপন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন আপাতত স্থগিত রাখা হোক' বলে জানানো হয়েছে। কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে আমাদের দেশে সমগ্র জনগণই হচ্ছে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মূলধারা। অতএব কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে শ্রেণীকরণের কোন প্রয়োজন নেই এবং এদেশের আদিবাসীদের উচ্ছেদ বা ঘরছাড়া করা হয়নি বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬]

---

১৪. ডা. দিলীপ দে সম্পাদিত, '*গ্লানি*' *(The Disgrace)*, op. cit.

১৫. পাক্ষিক *চিন্তা*, (ঢাকা, বছর ২, সংখ্যা ২৪ : ৩১শে শ্রাবণ, ১৪০০, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৩

১৬. সাপ্তাহিক '*যায় যায় দিন*' op. cit.

Dhaka University Institutional Repository



এ ব্যাপারে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান প্রমোদ মানকিন এম. পি. বলেন, 'আদিবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক সে সম্পর্কে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি তারা নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতির অধিকারী। বাংলাদেশে ৩০ টির অধিক ক্ষুদ্র জাতি আদিবাসী উপজাতি রয়েছে। এদের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ হবে। পররাষ্ট্র দফতরের উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে আদিবাসীদের মূল সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই চিঠি পড়ে মনে হয় সরকার আমাদের দায়দায়িত্ব বহন করতে রাজি নন'।[১৭]

ন্যাশনাল পার্ক রচনার জন্য মধুপুর গড় থেকে পাঁচ হাজারের বেশী আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করতে বনবিভাগ ১৯৬০ সাল থেকে চেষ্টা করে আসছে। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গারো, হাজং , রাজশাহী-দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল-উরাওদের বহু জমির প্রকৃত মালিকদের উপস্থিতিকে অবজ্ঞা করে অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় ফেলে বেদখল করা হচ্ছে।[১৮]

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা আছে "----- adequate, effective and mandatory safeguard should be specifically provided in the constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administration and other rights and interests in consultation with them."[১৯] (সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর এবং অলংঘনীয় রক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে রাখতে হবে।)

জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারা ২ এ উল্লেখ রয়েছে- "যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা: জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকার, ও স্বাধিকারে সত্ত্ববান। অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী তা স্বাধীন অছিভূক্ত এলাকা অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোনো প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।"[২০]

---

১৭. *Ibid.*
১৮. *Ibid.*
১৯. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী?* অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪৫
২০. ডা. দিলীপ দে সম্পাদিত, *'গ্লানি' (The Disgrace)*, *op. cit.*

Dhaka University Institutional Repository



আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) তার ১৬৯ নং কনভেনশন অনুসারে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থাদি নিতে সচেষ্ট রয়েছে।[২১] ILO কনভেনশন ১০৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে, আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং এই ভূমি কখনো তাদের হাত থেকে নেয়া হলেও তাদেরকে বিকল্প ভূমি বা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন এই কনভেনশনটি মেনে নিলেও সে অনুযায়ী কাজ করছে না। গারোদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ভূমির মালিক স্ত্রীদের হাতে থাকে। অনেক মুসলিম গারো মহিলাদের বিয়ে করে নিজেদের নামে জমির মালিকানা লিখিয়ে নিয়ে তারপর স্ত্রী ত্যাগ করে নিজে জমির মালিক হয়ে যাচ্ছে বলে জানাগেছে। এছাড়াও অজ্ঞতার কারণে মালিকের নামে জমি রেকর্ড না করার ফলেও আদিবাসীদের অনেকে ভূমিথেকে বিতাড়িত হচ্ছে।[২২] এভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন উৎপীড়ন ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। যার ভয়াবহ পরিনাম ক্ষয়িষ্ণু জাতীয় সংহতি। যে দেশে জাতীয় সংহতি অর্জন সম্ভব হয়নি সে দেশে জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠন বিলম্বিত হতে বাধ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি পাহাড়ীদের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের অসন্তোষ, ক্ষোভ এবং বৈষম্যের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হয়ে এখন বারুদাগারে পরিণত হয়ে দেশে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিশেষ করে জাতিগঠন ও সংহতির হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বিভিন্ন মতাদর্শের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সমস্যাকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে কর্মসূচী প্রণয়ন করছে। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য থাকায় সেখানের সমস্যা নিরসনের সমূহ সম্ভাবনা নিস্প্রভ প্রায়। গত ২রা ডিসেম্বর '৯৭ তারিখে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বৈষম্য ও জাতিগত অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে 'পার্বত্য জনসংহতি সমিতির' সাথে এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি এমন ধরনের কোনো ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু এই শান্তির সুবাতাস স্তব্ধ করে দিতে বিভিন্ন মহল অসন্তোষ, সহিংসতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক গতিধারায় যোগ করছে এক ভিন্নমাত্রা। ফলে সংকট যে অবস্থানে ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে সে অবস্থানেই রয়ে গেছে। সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

যেকোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাই কতোটা সম্প্রদায়ভিত্তিক বৈষম্য সহ্য করতে পারে তার একটি মাত্রা রয়েছে। এই মাত্রা অতিক্রম করলে অন্তর্গত অসংহতি হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এই নিয়ন্ত্রিত মাত্রার্জন সম্ভব

---

২১. পাক্ষিক *চিন্তা*, (ঢাকা, বছর ৩, সংখ্যা ৩ : ১৫ই আশ্বিন, ১৪০০, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)

২২. সাপ্তাহিক '*যায় যায় দিন*' *op. cit.*

Dhaka University Institutional Repository



একাধিক শর্তপূরণ সাপেক্ষে। এদের মধ্যে আছে : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সম্ভাব্য সুষম বন্টন, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণ ও বর্জনের অবিভাজ্য প্রতীক নির্মাণ এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিন্ন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা।[২৩] সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক অন্বয় ছাড়া এই বৃহত্তর সংহতি কিভাবে অর্জন সম্ভব, সেটি একটি মস্ত সমস্যা। গত তিনশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিযুক্তিকরণের ফলে ইউরোপে এই বৈপরীত্য সমাধান সম্ভব হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে আইনগত বিধি ব্যবস্থার বদলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও তার ফলে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়া যে এর পেছনে বেশী জোরদার অবদান রেখেছে তাও মানতে হবে।

**৩.২ জাতীয় পরিচয়গত সমস্যা**

একদিকে জাতিগঠন সমস্যা হচ্ছে জাতীয় পরিচয়গত সমস্যা। নতুন উদীয়মান রাষ্ট্র সমূহের ইতিহাসে এটি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংকট।[২৪] এ ধরনের রাষ্ট্র সমূহের সামাজিক গ্রুপগুলোর বিভাজন হচ্ছে দ্বিমূখী। এখন এ ধরনের রাষ্ট্রসমূহ একদিকে তাদের নৃতত্ত্বগত, ধর্মীয়, ভাষাগত অথবা আদিবাসী সংক্রান্ত সংযোগে দীর্ঘকালীন যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার সমস্যা মোকাবেলা করছে এবং অপরদিকে নতুন রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কিভাবে আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করছে। এ সমস্ত নতুন রাষ্ট্র সমূহে এটি একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে দিয়েছে খণ্ডিত জাতীয় পরিচয়। বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রসমূহের কর্তৃত্বকারী এলিট শ্রেণী এসমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করছে। সেজন্য কিভাবে মৌলিক অনুভূতিকে[২৫] নাগরিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত করা যায়; কিভাবে জাতীয় পরিচয়কে সংকীর্ণ পরিচয় থেকে আরও উচ্চতর ও উন্নত করা যায় এবং শেষতঃ বহু খণ্ডিত নতুন পরিচয় থেকে কিভাবে একটি জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যায় তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রতো শুধুমাত্র একটি আন্তর্জাতিক সৌজন্য[২৬] নয় বরং এটি একাধারে সরকারী বাস্তবতা।[২৭]

---

২৩. ডা. দিলীপ দে সম্পাদিত, *'গ্লানি' (The Disgrace)*, op. cit.

২৪. Claude E. Welch Jr. (ed.), *Political Modernization : A Reader in Comparative Change*, California : Duxbury Press, 1971, p. 168.

২৫. C. Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the new states", in C. Geertz (ed.) *Old Societies and New States- The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York : The Free Press of Glencoe, 1963, p. 109.

২৬. M. Nazrul Islam, *Problems of Nation Building in Developing Countries: The Case of Malaysia*, University of Dhaka, 1988, p.26 and also see author's *Pakistan and Malaysia : A Comparative Study in National Integration*, Sterling Publishers Ltd. New Delhi 1989.

২৭. Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*, New York: Columbia University Press, 1972, p.2.

Dhaka University Institutional Repository



সে যাই হোক, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশই জাতীয় সংহতির সংকটে নিপতিত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নাইজেরিয়ার কথা বলতে পারি। সেখানে একদিকে রয়েছে আদিবাসী, জাতিগত, এবং ভাষাগত বিভিন্নতা এবং অপরদিকে দেখি ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সনে সংঘটিত রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি বিনষ্টের জন্য সেনাবাহিনীর দায়ভার গ্রহণ।[২৮] ইসরাইল অবশ্য সেরকম মারাত্মক কোন জাতীয় সংহতির সংকটের সম্মুখীন হয়নি। তাদের উৎপত্তির ভিন্নতা এবং পৃথক জাতীয় ভাষাজনিত বৈপরীত্য ছাড়া। ইহুদীরা সর্বত্র তাদের যে বন্ধনীর বিস্তার বজায় রেখেছে তা তাদের ইহুদী পরিচয়কে আজও প্রাণবন্ত রেখেছে এবং তাদের মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ এর অন্যতম প্রধান কারণ।[২৯] ইসরাইল অবশ্য অন্য এক ধরনের জাতীয় সংহতির সমস্যায় পড়েছে। এটি অবশ্য ভাষাগত, অঞ্চলগত, রক্তের সম্পর্ক, বংশগত বা ধর্মগত দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত নয়। এ ধরনের সংহতির সংকটের শুরুটা হয়েছে যখন উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদীরা দেশান্তর হয়ে ইসরাইলে বসতি স্থাপন করে ইতোমধ্যে সেখানে প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমী সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত সমরূপতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই ব্যাঘাত মূলত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইহুদীদের[৩০] মধ্যে একটি সমস্যার সৃষ্টি করে দেয়। অবশ্য এটি সমভাবে চিহ্নিত করা কষ্ট হবে পূর্বের পাশ্চাত্য এবং পরের প্রাচ্যের পৃথক সংস্কৃতিগত ও সামাজিক পার্থক্য। সেজন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইহুদীদের এই বিভাজন প্রধানত পৃথক সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হলেও রক্তের সহজাত পার্থক্য, 'ধর্ম', এমনকি ভাষাগত পার্থক্যও সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়।[৩১]

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতিধারায় জাতীয় পরিচয়গত বিতর্ক এক মুখ্য আলোচনায় রূপ লাভ করেছে। 'বাঙালী' এবং 'বাংলাদেশী' এই শব্দদ্বয় বাংলাদেশের জনমানসে সৃষ্টি করেছে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্মি। বাংলাদেশের মানুষ 'বাঙালী' না 'বাংলাদেশী' সে সম্পর্কে তারা এখনও মনস্থির করতে পারেনি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'বাঙালী' বলতে বাংলাদেশের নাগরিকতাকে বুঝানো হয়েছে এবং 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' বলতে বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতিকে বুঝানো হয়েছে, যা একটি সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তার ভাষা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভূখণ্ড প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি জাতির

---

২৮. M. Nazrul Islam, *op. cit.*, p. 26.
২৯. Maurice M. Roumani, *National Integration-A Conceptual Frame Work Plural Societies*, Vol. 9, No. 2 and 3 (Summer/Autumn 1978), p. 26.
৩০. M. Nazrul Islam, *op. cit.*, p. 27.
৩১. Maurice M. Roumani, *op. cit.*, p. 27.

Dhaka University Institutional Repository



পরিচয়ে একটি সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতীক যেমন ভাষা, ধর্ম, ভূখণ্ড, বর্ণ প্রয়োজন।[৩২] ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম মূলনীতি হল ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism) এবং জাতীয়তাবাদ (Nationalism) । কিন্তু ১৯৭৭ সালে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা বদলে করা হল "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" [৩৩] এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তন করে করা হল 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'।[৩৪] সমস্যার সূত্রপাত মূলতঃ এখান থেকেই।

কোনো কোনো লেখকের মতে, জাতিত্ব ও জাতীয়তা যেমন সমার্থক নয়, 'বাঙালী' ও 'বাংলাদেশী' এ দুটো শব্দও তেমনি গুনগতভাবে ভিন্ন। জাতিত্ব ও জাতীয়তার শর্তাবলী ও উপকরণ মূলতঃ এক হলেও উভয়ের বিকাশে মৌলিক বিভিন্নতা রয়েছে। প্রথমটি নৃতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। জাতিত্ব একটি মানবগোত্রের ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নির্ধারক। জাতীয়তাবাদ সেই মানবগোত্রের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক উন্মেষের আদর্শগত চেতনা। জাতিত্বের কিংবা জাতিত্বসমূহের সহ অবস্থান সম্ভব। কিন্তু জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়েই বিকাশলাভ করতে পারে।[৩৫] এ সকল লেখকদের মতে আমাদের জাতিত্বের পরিচয় হবে 'বাঙালী' কিন্তু জাতীয়তার পরিচয় হবে 'বাংলাদেশী'। কেউ কেউ দ্বিমতও পোষণ করেন। তাদের মতে 'জাতীয়তা' অর্জন করা যায়না বা পরিবর্তন করাও যায়না। নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় এবং পরিবর্তন করাও যায়। জাতীয়তার জন্ম বংশ এবং আবহমান ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা ও ঐতিহ্য সূত্রে গ্রথিত। নাগরিকত্ব ব্যক্তি বিশেষের গ্রহণ বর্জনের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। একজন ইচ্ছে করলেই ইংরেজ, আইরিশ অথবা স্কটিশ জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারেনা; নিজকে ইংরেজ বা আইরিশ বলে পরিচয় দিতে পারেনা। কিন্তু এই তিনটি দেশ মিলে যে বৃটেন বা ইউনাইটেড কিংডম তার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ব্রিটিশ বলে পরিচয় দিতে পারে।[৩৬] একজন বিদেশী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়ে বাংলাদেশী হতে পারে কিন্তু তার জাতীয়তা কখনই বাঙালী নয় এবং তার জাতীয়তাবাদও বাঙালী নয়।

---

৩২. Paul R. Brass, "Ethnic Groups and Nationalities : The Formation, Persistence and Transformation of Ethnic identities over time", Quoted in T. Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka, BBI, 1980, p. 241.

৩৩. The Constitution of the people Republic of Bangladesh (As modified up to 28th February 1979), Ministry of law and Parliamentary Affairs, Govt. of Bangladesh, p. 5 also see Appendix XVII, pp. 152-4.

৩৪. *Ibid.*, p. 152.

৩৫. এনায়েতুল্লাহ খান, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ১৩৩

৩৬. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *op. cit.*, pp. 72-73.

Dhaka University Institutional Repository



"বাংলাদেশের মানুষ একটি জাতি, কারণ তারা একটি জাতি হতে চায়, অন্য কিছু নয়। জাতি হিসেবে মৃত বা জীবন্ত ঐতিহ্যের যা তাকে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করেছে, তার কোন তালিকা এই জাতিসত্তাকেব্যাখ্যা করতে বা অস্বীকৃতি দিতে পারেনা। এই জাতিকে বৈরী করেছে তার অনমনীয় গর্ব, সুখ-দু:খে আট কোটি মানুষের সঙ্গে একই পরিচয় বহন করা, অন্য কিছু নয়। শুধু বাঙালী হতে চাওয়ার জেদ।"[৩৭] বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম, বিকাশ, উত্থান ও পরিণতির কথা বুঝতে হলে নৃতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও নৈসর্গিক সংগঠনের বিশ্লেষণ যেমন দরকার তেমনি দরকার এদেশের সমাজ বিন্যাসের ইতিহাস। জাতিগঠনের সমস্ত উপাদান বাংলাদেশে বহুদিন ধরে বিদ্যমান থাকলেও তা সংহত হয়ে সব বাংলাভাষীকে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। জাতীয় পরিচয়গত সমস্যার অভ্যুদয়ের ফলে দেশে দু'টি মূলধারার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়েছে ও জাতিগঠন প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায় এই জাতীয়তাবাদ বিতর্ক কিংবা জাতীয় পরিচয়গত সমস্যার ঘুরপাকে পড়ে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়েছে।

আসলে এথনিক (ethnic) অভিন্নতার দিক থেকে, এক ভাষা, সমসত্তাবিশিষ্ট সংস্কৃতি ও বাসভূমির ভৌগলিক একত্বের বিচারে বাঙালীরা জাতি হিসেবে শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই শুধুমাত্র চীনাদের পর একক বড় জাতি। ভাষাভাষী লোকসংখ্যার দিক দিয়েও বাঙলা ভাষার স্থান চীনা ও ইংরেজীর পরেই। এই সুবৃহৎ জাতির পূর্বপুরুষেরা বাঙলা ভূখণ্ডে কত হাজার বছর আগে আগমন করেছিল, তা এখনও অজানা থাকলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তাদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে- যাদের আদি বাঙালী নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। গ্রীক ইতিহাসবিদ টোলেমি ও দিওদোরাস বর্ণিত গাঙেয় ব-দ্বীপের 'গঙারিডই' ছিল খৃষ্টপূর্ব যুগের বাঙলার এরকম একটি আদি বাঙালীদের (Proto-Bengalee) রাষ্ট্র। মধ্য যুগের তুর্কী শাসনের (১২০৩-১৫৩৮) আগে পর্যন্ত আদিবাঙালীদের বিছিন্ন জনগোষ্ঠী গুলি বাঙলাদেশের তিনটি অঞ্চলে বাস করত। (১) সমতট-হরিকেল বা পূর্ববঙ্গ, (২) গৌড় বা উত্তরবঙ্গ এবং (৩) রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলতে শুধুমাত্র সমতট অঞ্চলকেই বুঝাতো- যা বর্তমানের ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং যার কেন্দ্রভূমি ছিল ঢাকা-ফরিদপুর জেলা। আদিবাঙালীদের যে জনগোষ্ঠীটি 'বাঙ্গাল' নামে পরিচিত ছিল তারাই ঐ অঞ্চলের প্রথম বসতি স্থাপনকারী এবং কালক্রমে তাদের নামেই পুরো

---

৩৭. আবদুর রাজ্জাক, "বাঙলাদেশ : জাতির অবস্থা", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p. 4.

Dhaka University Institutional Repository



দেশটির নাম হয়েছে। অনুরূপভাবে আদিবাঙালীদের একটি জনগোষ্ঠী পুন্ড্ররা গৌড় বা বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী ছিল। এবং সুহ্ম নামের উপজাতিটি রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করতো। 'গঙ্গা', 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' শব্দগুলি সম্ভবত অস্ট্রিক। ঐতিহাসিক যুগে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রোটোবাঙালী উপজাতির আবাস ছিল। গুপ্ত পরবর্তীযুগে তারা এক ভাষা, সংস্কৃতি, ও লোকাচারে ক্রমশঃ সংহত হয়ে একটি জাতির রূপ নেয়।[৩৮] অষ্টম শতাব্দীতে বাঙালীর প্রথম জাতীয় রাষ্ট্র সম্ভবত পালরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন তাঁদেরই কীর্তি। বরেন্দ্র অঞ্চলে বাঙালীর রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা গৌড় নামে পুরো ভারতে পরিচিতি লাভ করে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের উপজাতি বলা হয় তারাই আসলে আদি বাঙালী।[৩৯] বাঙলার তিনটি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাঙালীরা উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেছিল, পুরাতাত্ত্বিক ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ যতই ক্ষীণ হোক এই তথ্যটি অনস্বীকার্য। আদি বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত। সুবোধ ঘোষের মতে, "সুদুর অতীতে অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো এই উপমহাদেশের মাটিতেও হয়তো এক শ্রেণীর দ্বিপদ বৃক্ষচর প্রাণী নিতান্ত জন্তুদশা থেকে কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে নরদশা লাভ করেছে।"[৪০] নৃতত্ত্ববিদ ড. জে. এইচ. হাটনও এখানকার আদি অধিবাসী হিসেবে উপজাতিদের পক্ষে মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণা ক্রমবিবর্তন ও বিভিন্ন সময়ের বংশানুক্রমিক রক্তের মিশ্রণে এই সব আদিমানব নিজেদের আদিম অবস্থা হারিয়ে ফেলেছে।[৪১]

এখানে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে যারা অষ্ট্রেলিয়ান হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করে তারা মূলতঃ কেউই আদি অষ্ট্রেলিয়ান নয়। ব্রিটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক এর অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিস্কারের পর অধিক সংখ্যক ব্রিটিশ, এবং পরবর্তীতে আমেরিকান, ডাচ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা এসে অষ্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করে। মূলতঃ ব্রিটিশরাই দু'শ বৎসর আগে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগকে পরাজিত করে তাদের রাজত্ব কায়েম করে। আদিবাসীদের দূরবস্থা নিয়ে খুব কম অষ্ট্রেলিয়ই ভাবে। ১৯৯৩ সালে আদিবাসীরা তাদের মাতৃভূমি দাবীর অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হাওয়ার্ড এসব অধিকার কেড়ে নিতে আইন জারীর প্রস্তাব করেছে।[৪২] ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে

---

৩৮. আসহাবুর রহমান, "বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমস্যা", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p. 62.

৩৯. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *op. cit.*, p. 71.

৪০. সুবোধ ঘোষ, "ভারতের আদিবাসী" পৃ: ৪। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক, *আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১১

৪১. Census Report of Bengal, 1931.

৪২. দৈনিক *সংবাদ*, (ঢাকা, ১২ই জুন, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



প্রকাশিত অষ্ট্রেলীয় মানবিক অধিকার কমিশনের ৬৮৯ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদনে অষ্ট্রেলীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যা, ও আদিবাসীদের প্রতি বর্বরতাকে নাৎসীদের গ্যাস কুঠুরিতে পরিচালিত নির্যাতন বা রুয়ান্ডার গণহত্যার সাথে তুলনা করা হয়।[৪৩] দীর্ঘ দু'শ বৎসরের শাসন, শোষণ ও অবস্থানের মাধ্যমে ব্রিটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা স্থায়ী ভাবে অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্বের দাবীদার। কিন্তু তাই বলে আদিবাসীরা (Aborigine) ভিন দেশের নয় তারাই মূলতঃ আদি অষ্ট্রেলিয়ান।

আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও চক্রান্তের ফলে জার্মানী, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এ সব দেশের দু'অংশে দু'ধরনের পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম অথবা পূর্ব জার্মানী, উত্তর অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনাম এদের কোন্‌টিই নিজেকে পৃথকভাবে জাতি হিসেবে ঘোষণা করেনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে বিরাট তারতম্য, মৌলিক প্রভেদ সত্ত্বেও পৃথক জাতিসত্তার প্রশ্ন ঐসমস্ত দ্বিধাবিভক্ত দেশে ওঠেনি। কিন্তু বাংলাদেশে আজ তা উঠেছে।[৪৪] বাঙলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রত্যয় এখনও প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এ বিভ্রান্তিকে আরও জটিল করে তুলেছেন। এ বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বুদ্ধিজীবিদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তাও প্রায় অনুপস্থিত।[৪৫]

জাতীয়তার প্রশ্নটি আবেগ ছাড়াও উপলব্ধির, অনুভবের, চেতনার ব্যাপার : অনেক ক্ষেত্রে বহু শতাব্দীব্যাপী। জাতীয়তার একটি গুণই হচ্ছে মানসিক চেতনা; শুধু জনসমষ্টি দিয়ে জাতি হয়না। চল্লিশের দশকের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় ছিল খানিকটা দৈশিক, কিন্তু অনেকটাই সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতাই তখন ছিল জাতীয়তা। ঐ সময়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ধর্মীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগে রাজী হয়েছেন। কিন্তু উপমহাদেশের বহুজাতি, বহুবর্ণ ও বহু ভাষাভিত্তিক (multi–national, multi–lingual and multi-cultural) অস্তিত্বকে মেনে নিতে রাজী হননি। উপমহাদেশের বহুজাতি ভিত্তিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার সমস্যাগুলো অমীমাংসিত রেখে, ধর্মীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের অবাস্তব ছুড়িতে

---

৪৩. *Ibid.*

৪৪. বদরুদ্দীন উমর, "বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p. 94.

৪৫. এমাজউদ্দীন আহমদ, "বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি : ক'টি প্রশ্ন", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p. 96.

Dhaka University Institutional Repository



উপমহাদেশ ভাগ করেও যে সমস্যার সমাধান হয়নি তার প্রমাণ শুধু বাংলাদেশ নয় খণ্ডিত উপমহাদেশের সর্বত্র এখন বিভিন্ন অস্বীকৃত ও নির্যাতিত এবং বৈষম্য পীড়িত জাতিসত্তার অভ্যুত্থান এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হানাহানি।[৪৬]

মওলানা আবুল কালাম আজাদ এর মতে, 'It is one of the greatest frauds on the people to suggest that religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistic, economic and political frontiers. History has however proved that after the first few decades or at the most after the first century. Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone.' [৪৭] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেও ভালভাবে জানতেন তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্বের অসাড়তার কথা। মাউন্টব্যাটেন এর Punjub এবং Bengal ভাগ করার পরিকল্পনার বিরোধীতা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধেই যুক্তি উথাপন করেছিলেন, "A man is Punjabi or a Bengali before he is Hindu or Moslem. They share a common history, language, Culture and economy. You must not divide them. You will cause endless blood shed and trouble." [৪৮] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। এই যুদ্ধ কেবল একটি স্বাধীন দেশের বা স্বাধীন জাতির জন্ম দেয়নি। এই মহান যুদ্ধের সফল পরিণতির সাথে সাথে এটাও প্রমাণ করেছে যে ধর্ম কোন জাতিসত্তার ভিত্তি হতে পারেনা। জাতিগঠনে ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি উপাদানগুলোর ভূমিকা ধর্মের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ শাসনের বিভেদনীতি থেকে প্রথমে হিন্দু মধ্যবিত্ত এলিট এবং পরে মুসলমান মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর বিকাশ। এদের পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আরও ঘনীভূত করেছে এবং বাঙালীর জাতীয় সত্তাকে খণ্ডিত এবং বিকৃত সাম্প্রদায়িক পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে।

---

৪৬. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *op. cit.*, p. 14.

৪৭. Maulana Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Orient Longman, New Delhi, 1989, p. 248.

৪৮. Larry Collins and Dominique Lapierre, *Freedom at midnight*, Tarang Paperbacks, New Delhi, 1988, p. 104.

Dhaka University Institutional Repository



আমরা আগে বাঙালী না মুসলমান, আমরা বাঙালী না বাংলাদেশী প্রভৃতি প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি দ্বারা বাঙালীর জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীকারকেই বারংবার ধ্বংস করার অপচেষ্টা হয়েছে।[৪৯]

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ তার, 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ে লিখেছেন- "আমাদের বাঙালী জাতীয়তার মূলনীতিতে ভারতের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ ছিল। ..... উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য এলাকার বাঙালীরা ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বাঙালীর পলিটিক্যাল ন্যাশনহুডের উত্তরাধিকার হিন্দু,মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে একমাত্র বাংলাদেশের বাঙালীদের উপর বর্তায় এবং এই 'বাঙালী জাতীয়তা' সম্পর্কে ভারত শঙ্কিত'।[৫০]

এ্যান্থনী মাসকারেনহাস মনে করেন যে, বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙালী বলে অভিহিত করে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। কেননা, এই বাঙালী জাতীয়তাবাদের অবাঞ্ছিত সংশ্লেষ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যেতে পারে ভবিষ্যতে, এমন আশংকা ছিল। আর তাই জিয়াউর রহমান যখন নাগরিকদের পরিচয় স্থির করলেন বাংলাদেশী বলে, তখন ভারত তা স্বাগত জানালো।[৫১]

একথা মনে করার প্রচুর কারণ রয়েছে যে বর্তমান বাঙলাদেশের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ, ইসলামী মৌলবাদ ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আদর্শসমূহের রাজনৈতিক অনুসারীরা ও রাজনৈতিক দলগুলো প্রকৃতপক্ষে, জেনেহোক, না জেনেহোক, দিল্লীর স্বার্থেরই বিশ্বস্ত সেবক। কারণ বাঙালীর সাম্প্রদায়িক বিভক্তিতে এদেশে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের যেমন আপাতঃ লাভ তেমনি দিল্লীকেন্দ্রীক শাসক সম্প্রদায়েরও লাভ। স্বার্থের ঐক্য রাজনীতিতে দু'টি বিষম পক্ষকেও ঐক্যবদ্ধ করে থাকে।[৫২] যেহেতু বর্তমান বাঙলাদেশ রাষ্ট্র বাঙলা ভূখণ্ডের ও বাঙালী জাতির একটি অংশকে নিয়ে গঠিত, যে অংশে দেশবিভাগ জনিত কারণে মুসলিমরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেহেতু 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এই রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তি হয়েছে। তাই 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' ও 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এর বৈরিতার অবসানের মধ্যে 'বাঙালী জাতীয়তার' অমীমাংসিত প্রশ্নটির সমাধানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।[৫৩]

---

৪৯. আবদুল গাফফার চৌধুরী, *op. cit.*, p. 14.

৫০. আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬১৫-৬১৬

৫১. Antony Mascarenhas, *Bangladesh A Legacy of Blood*, London, 1986, p. 125.

৫২. হবসে আজাদ, "বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p. 87.

৫৩. *Ibid.*, p. 86.

Dhaka University Institutional Repository



কোনো কোনো লেখকের মতে, 'বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তার তিনটি পরিচয় রয়েছে- 'বাঙালী' 'বাংলাদেশী' ও 'মুসলিম'। এই তিনটি উপাদান সমন্বয়েই আমাদের জাতিসত্তার আসল ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। এ তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের মানুষের 'বাঙালী জাতিসত্তা' 'বাংলাদেশী জাতিসত্তা' ও 'মুসলিম জাতিসত্তা' একদেহে লীন।[৫৪] যারা যুগপৎ মুসলিম, বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী তারাই এর জাতিসত্তার মৌল নিয়ামক শক্তি আর যারা শুধু বাঙালী ও বাংলাদেশী অথবা শুধু বাংলাদেশী (যেমন উপজাতিসমূহ) তারা রাজনৈতিকভাবে, ভৌগলিক ও ভাষাগতভাবে এদেশের জাতিসত্তার সাথেযুক্ত। তারা জাতিসত্তার নিয়ামক নয় তারা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় সংযুক্তমাত্র।[৫৫]

গত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে মনে হয়, বাংলাদেশের মানুষের মনে জাতীয়তার ধারণা এখনও পরিস্কার হয়ে ওঠেনি। এ সম্পর্কে প্রচুর অনিশ্চয়তা বর্তমান এবং তারা নানারূপ ধারণায় দোদুল্যমান।[৫৬] জাতীয় পরিচয়গত সমস্যার অহেতুক বিতর্কের যাতাকলে পড়ে বাংলাদেশ নামক এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটির অধিবাসীর মধ্যকার সম্প্রীতি ও সদ্ভাব উত্তরোত্তর ক্ষুন্ন হচ্ছে। কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট এই সমস্যার ফলে জাতিগঠন একপ্রকার হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, এদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ও মানসগঠন, অর্থনৈতিক অবস্থা ও আশা আকাঙ্খা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই জন্ম নিয়েছে এদেশের জাতীয়তাবাদ, গড়ে উঠেছে নতুন রাষ্ট্র তার বিশিষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতে।[৫৭]

ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগ শেষে বাঙালী জাতির ভবিষ্যত আজ বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর বর্তেছে। মুক্তি আন্দোলনের সময় *জাগো জাগো বাঙালী জাগো* বলে যে শ্লোগান দেওয়া হয় তা বাঙালীর ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গের এই চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭ এর মৃতবৎ অখণ্ড সার্বভৌমবঙ্গের চেতনা হতেও স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে অবশ্য পুরানো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।[৫৮]

এই জাতীয় পরিচয় ও জাতীয়তাবাদের মূলশক্তি জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ও তার জন্যে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক দূর্গ- রচনা করা যে একান্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে এখন আর সংশয় নেই।

---

৫৪. আহমদ আবদুল কাদের, "আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ", মাহবুবুর রহমান মোরশেদ সম্পাদিত, *মানব উন্নয়ন জার্ণাল*, (ঢাকা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১; মার্চ, ১৯৮৯, ঢাকা-১০০০), পৃষ্ঠা ৬৬

৫৫. *Ibid.*

৫৬. আবদুল হক, "দোদুল্যমান জাতীয়তা", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, *op. cit.*, p.35

৫৭. বিচিত্রা ভাষ্যকার "বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ও উত্থান", *Ibid.*, p. 138.

৫৮. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, দ্বি-স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

## চতুর্থ অধ্যায়

## রাজনৈতিক সংহতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠী সুদূর অতীতে বাংলাদেশের মূলজনগোষ্ঠী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ী এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছে। ১৫৫০ সালে Joan de Barros নামের জনৈক পর্তুগিজের আঁকা 'Deseripco Detno De Bangala' মানচিত্র থেকে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে দু'টি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'Chacomas' নামে একটি রাজ্য ছিল বলে জানা যায়।[১] এছাড়া Reno De Tipora নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। Chacomas রাজ্যটি শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব এবং আরাকানের উত্তর অর্থাৎ সাবেক বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী পাহাড়ীদের আগমন শত শত বছর পূর্বেই হয়েছিল। ইতিহাস বলে এশিয়ার পার্বত্য এলাকায় ১২ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষমতার লড়াই ও জাতিগত দাঙ্গা হাঙ্গামায় ঘরবাড়ি থেকে বিচ্যুত পলায়নপর জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। এ পার্বত্য অঞ্চলের কুকি আদিবাসীদের এসব বহিরাগতরা আরো নিবিড় পার্বত্য অঞ্চলে হটিয়ে দেয়। আবার অন্যদিকে রাঙামাটি, বান্দরবান, মানিকছড়ি ও রামগড়ের মতো কিছু পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ীরা উন্নত জীবনের আকাঙ্খায় এশিয়ার বিভিন্ন সামুদ্রিক বন্দর নগরীতে ধাবিত হয়। এরূপ আদিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ ছাড়াও মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও ছিলেন।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেই সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতির বাস। এদের মধ্যে দশ ভাষাভাষী ১৩ টি জুম্ম জাতি বা পাহাড়ী জাতি রয়েছে। পাহাড়ী জাতিগুলো হচ্ছে চাকমা (প্রকৃত পক্ষে চাংমা), মারমা, ত্রিপুরা মুরং (ম্রো), বোম (বনযোগী), খুমী, খ্যাং (খিয়াং) চাক, তঞ্চঙ্গ্যা (চাকমা জাতির শাখা) লুসাই (কুকি), রিয়াং ও উসুই (ত্রিপুরা জাতির শাখা) এবং পাংখো (পাংখোয়া)।[২] তবে মগ সম্প্রদায়ের কিছু লোক কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় বসবাস করে। তাছাড়া সিলেট জেলার খাসীয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় সংলগ্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে খাসীয়া, মনিপুরী ও পাঙোন; ময়মনসিংহের গারো পাহাড় সংলগ্ন হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী কলমাকান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চলে গারো, হাজং, হদি, দালুই, পালিয়া, বোনা এবং রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহীর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে ওরাও, সাঁওতাল, রাজবংশী, হো মুন্ডা, পালিয়া উপজাতি জনগোষ্ঠী।[৩]

---

১. জেসমিন আহমেদ, "পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কত দিন রক্ত ঝরবে!" পাক্ষিক *চিন্তা*, (ঢাকা, বছর ৩, সংখ্যা ১৩, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪)

২. প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৩

৩. আব্দুস সাত্তার, *আরণ্য সংস্কৃতি*, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে সোফার[৪] 'টিলাবাসী পাহাড়ী' ও 'তীরবাসী পাহাড়ী' এবং হান্টার[৫] তাদেরকে যথাক্রমে 'পাহাড়ী উপজাতি' এবং 'উপত্যকাবাসী উপজাতি' হিসেবে বিভক্ত করেছেন। পাহাড়ী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো হল যথাক্রমে লুসাই, পাংখুয়া, বোম, ম্রো ও খুমী এবং উপত্যকাবাসী উপজাতিরা হল চাকমা, তেঞ্চঙ্গা, রিয়াং, খিয়াং, চাক ও মুরং গোষ্ঠীভুক্ত।

বসত এলাকাকে কেন্দ্র করে এদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হলেও ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্যের বিবেচনায় প্রত্যেকটি উপজাতিই আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। ভাষাগত বৈসাদৃশ্য ছাড়াও উপজাতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে। চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তঞ্চঙ্গা প্রভৃতি উপজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; ত্রিপুরা ও রিয়াং উপজাতিরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, লুসাই, পাংখু ও বনযোগী উপজাতিরা খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী-সর্বপ্রাণবাদী বা Animist.[৬]

বাংলাদেশের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা বিচিত্রখাতে প্রবাহিত এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত। এরা সমতল ভূমির বাঙালী জনজীবন হতে বিভিন্ন দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয়রা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নয় এবং তারা এতই অসচেতন, বিক্ষিপ্ত ও নগণ্য যে তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ও তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিরা যদিও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারায় অভ্যস্ত তবে দীর্ঘদিন একই অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার মধ্যদিয়ে তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা সংহতি গড়ে উঠেছে। অধিকন্তু, অঞ্চলগত বিবেচনায় তারা নগণ্যও নয়। সঙ্গত কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের উত্থাপিত রাজনৈতিক দাবী বা তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশের অখণ্ড জাতিসত্তার বিষয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

### ৪.১ প্রাক ব্রিটিশ আমল

পার্বত্য চট্টগ্রাম সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। চৌদ্দশত বৎসর আগে আনুমানিক ৫৯০ সালে চাকমা যুবরাজ বিজয়গিরি ও তার সেনাপতি রাধামন খীসা রোয়াং রাজ্য (বর্তমান রামু), অক্সাদেশ (আরাকান সীমান্ত), খ্যয়ংদেশ, কাঞ্চননগর

---

৪. David Sofar, "Population Dislocation in the Hill Tracts", *The Geographical Review*, 53 (1964), pp. 337-362.

৫. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, New Delhi, D. K. Publishing House, Vol. 6, 1973.

৬. Syed Nazmul Ahasan & Bhumitra Chakma, "Problems of National Integration in Bangladesh: The Chittagong Hill Tracts", *Asian Survey*, Vol. 29, No. 1, October, 1989.

Dhaka University Institutional Repository



(কাঞ্চনদেশ) ও কালঞ্জর (কুকি রাজ্য) প্রভৃতি রাজ্য জয় করলে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য চাকমা রাজার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তখন সাপ্রেই কূলে চাকমা রাজার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। স্যার রিজলীর মতে, ব্রহ্ম ভাষার 'সাক' বা 'সেক' জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি। এতদঞ্চলে চাকমা জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ক্যাপ্টেন লুইন বলেন, "..... the name Chakma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District, and the largest and dominant section of the tribe recognises this as its rightful appellation. It is also sometimes spelt Tsakma or Tsak, or as it is called in Burmese Thek."[৭] ১৪০০ সালের দিকে আরাকান রাজার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে চাকমারাজা মইসাং (মংছুই) মংজাক্র থেকে তৈনছড়ি নদীর তীরে চলে আসে। ১৪১৮ সালে রাজা মইসাং এর মৃত্যুর পর তার পুত্র মারেক্যা রাজা হন। রাজা মারেক্যা বা মানিকগিরির মৃত্যুর পর তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রী থৈন সুরেস্বরী রাজা হন। কারণ রাজা মানেকগিরি নিঃসন্তান ছিলেন। ১৫১৬ সালে রাজা থৈন সুরেস্বরীর মৃত্যুর পর তার পুত্র জনু (চন্দুই) রাজত্বভাব গ্রহণ করেন। ১৫২০ সালে চাকমা রাজার রাজ্যসীমা স্থির করা হয়। এই সীমা ছিল এরকমের: পূর্বে নাফ্রে (বর্তমান নাফ) নদী, পশ্চিমে সীতাকুণ্ড পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে চাঁইচাল পর্বতশ্রেণী। রাজা জনুর মৃত্যুর পর বুড়া বড়ুয়া রাজা হন। ১৬৩৮ সালে বুড়া বড়ুয়ার মৃত্যুর পর সাত্তুয়া বড়ুয়া রাজা হন। সাত্তুয়া বড়ুয়াকে 'পাগলা রাজা'ও বলা হয়। রাজার মৃত্যুর পর রাণী কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। রাণীর মৃত্যুর পর তাঁর চার অমাত্যের ভেতর থেকে ধামানাকে রাজা নির্বাচন করা হয়। সপ্তদশ শতকে মোঘল যুবরাজ শাহ সুজাউদ্দৌলার কন্যার সাথে চাকমা রাজা ধামানার পুত্র যুবরাজ ধরম্যার বিয়ে হয়। মোঘল কন্যার গর্ভজাত সন্তান বিধায় স্বামী ও স্ত্রীর সম্মতিক্রমে ধরম্যার পুত্রের নাম রাখা হয় 'মঙ্গল্যা'। এ ঘটনার পর থেকেই চাকমা রাজা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মুসলিম নাম গ্রহণ করতে থাকেন। যেমন মঙ্গল্যার দু'পুত্রের নাম যথাক্রমে জুবল খাঁ ও জল্লাল খাঁ। রাজা ধরম্যার মৃত্যুর পর তার পুত্র মঙ্গল্যা রাজা হন। ১৭১২ সালে মঙ্গল্যার মৃত্যুর পর রাজা হন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুবল খাঁ। জুবল খাঁর মৃত্যুর পর তার ভাই জল্লাল খাঁ রাজা হন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতে খাঁ তাকে রাজকার্যে সহায়তা করেন। ১৭১৫ সালে যুবরাজ ফতে খাঁ সর্বপ্রথম নবাবদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফররুখ শাহ্ ও মোহাম্মদ শাহ্ এর অনুমতি নিয়ে ১১ মন তুলোর বিনিময়ে নিম্নভূমির বেপারীদের সাথে জুম চাষীদের ব্যবসা করার অনুমতি দেন। ১৭১৫ সালে জল্লাল খাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ ফতে খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৩৭ সালে ফতে খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেরমুস্ত খাঁ রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে

---

৭. T.H. Lewin, "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein", p. 62.

Dhaka University Institutional Repository



চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত পার্বত্য অংশ তাঁর অধিকারে ছিল। তাঁর রাজ্য সীমা উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান, পূর্বে লুসাই পাহাড় (কুকি রাজ্য) ও পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা-ট্রাঙ্ক রোড) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৬৬ সালে ব্রিটিশ কোম্পানীর চট্টগ্রাম প্রধান মি. হেনরি ভেরেলিষ্টের বিবরণ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম গেজেটেও এই সীমানা দেখা যায়। শেরমুস্ত খাঁর রাজধানী ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের মাতামুহুরী[৮] নদীর তীরবর্তী আলিকদম। ১৭৫৭ সালে রাজা শেরমস্ত খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন মোঘল আমলের শেষ রাজা।

### ৪.২ ব্রিটিশ আমল

১৭১৫ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত মোঘল শাসন আমলে এবং ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসন আমলে এ অঞ্চলে কার্পাস বা তুলার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো বলে এ অঞ্চল "কার্পাস মহল" নামে পরিচিত ছিল।[৯] অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা ছিলেন স্বাধীন, অঞ্চলের উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। জুমচাষ অব্যক্তিমালিকানা ও বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন সময়ে সীমান্তে বাণিজ্য নিয়ে চাকমাদের সাথে বাঙালীদের সংঘর্ষ হয়। অবশেষে ১৭১৫ সালে চাকমারাজা জল্লাল খাঁন চট্টগ্রামের মুঘল গভর্ণরের সঙ্গে চুক্তিতে আসেন। ১৭৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিজয়ের পর একের পর এক এই অঞ্চলে হামলা পরিচালিত হয়। পরে ১৭৮৭ সালে চাকমারাজা জানবক্স খাঁ সমঝোতা সাপেক্ষে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করার পর তা সম্পূর্ণ রূপে কোম্পানীর প্রভাবাধীনে চলে আসে।[১০] তারপর ব্রিটিশরা রাজা জানবক্সের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ কোম্পানী এ অঞ্চলে শাসনভার গ্রহণ করার পর এ জেলার অধিবাসী আদিবাসীগণের স্বভাবের সরলতা ও ব্যবহারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্যতাহেতু এ অঞ্চকে একই শাসননীতির পর্যায়ে রাখার উপযোগী মনে করলেন না। এ সমস্ত কারণে ১৮৬০ সালে এ অঞ্চল আদিবাসী (পাহাড়ী) এলাকা হিসেবে পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে।[১১] ১৮৬১ সালে পার্লামেন্টে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয়। রেগুলেশন বহির্ভূত অঞ্চলের জন্য গভর্ণর জেনারেল বা স্থানীয়

---

৮. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, pp. 15-16.

৯. বিপ্লব চাকমা, '*Ray*', (ঢাকা, ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজুসংকলন, ১৩৯২ বাংলা)

১০. Raja Devasish Roy, "The Erosion of Legal and Constitutional Safeguard of the Hill People of the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: An Historical Account", ১৯৯২ সালে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

১১. বিপ্লব চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, রাঙামাটি, প্রকাশনা-০০১, এপ্রিল ১৯৯৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository



কর্তৃপক্ষ যে সব বিধি নির্দেশ তৈরী করেছিলেন, এ আইনে সেগুলি সমর্থিত হয়। ১৮৭০ সালে Government of India Act পাশ করে বিশেষঅঞ্চল শাসনের জন্য যেসব বিধিনির্দেশ তৈরী করা হয়, গভর্ণর জেনারেলকে তা অনুমোদনের জন্য ক্ষমতাপ্রদান করা হয়। এর ফলে বাঙালোর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আরও বহু অঞ্চল তার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন এ জেলা চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু উপজাতিরা স্বকীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারায় চট্টগ্রাম জেলার জনসমাজ হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় দুর্গম পাহাড় জংগলাকীর্ণ জেলার অনগ্রসর আদিবাসীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তখন অনিবার্য কারণে এক বিশেষ বিধির উপর আরোপিত হয়।

১৮৬০ সালের ২৬শে জুনের 'Notification No 3302' অনুসারে ১লা আগষ্ট 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০' অনুসারে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[১২] তখন এ জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য কতিপয় আইন প্রণয়ন করা হয়। সেগুলো হল-

১. রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব এ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০

২. এ্যাক্ট ৪ (ডি.সি) অব ১৮৬৩

৩. রেগুলেশন ৫ অব ১৮৭৩ এবং

৪. রেগুলেশন ৩ অব ১৮৮১।[১৩]

ইতিহাসের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অতীতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বিদ্রোহী হয়েছে। তাদের স্বীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর যাতে আঘাত না আসে এ দিকটি চিন্তা করেই ইংরেজগণ চট্টগ্রামে আসার পর এই পার্বত্য অঞ্চলকে সরাসরি তাদের প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া বৃটেনের বস্ত্র কারখানাগুলো চালু রাখতে তুলা উৎপাদন যাতে ব্যহত না হয়, সেজন্য ইংরেজরা এ অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেনি।

১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জেলার অংশ হিসেবেই ছিল। তারপর একে চট্টগ্রাম থেকে আলাদা করে পাহাড় তত্ত্বাবধায়ক (Hill Superintendent) নামে একজন রাজকর্মচারীর অধীনে দেয়া হয়। সাত বছর পর তাঁর কাজের দায়িত্ব সম্প্রসারিত করে তাঁকে ডেপুটি কমিশনার (প্রশাসন) আখ্যা দেয়া হয়। ১৮৯১ সালে লুসাই পাহাড় ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে এলে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায় এবং এই অঞ্চলকে

---

১২. Vide Bengal Govt. Act. XXIII dt. 1.8.1860.

১৩. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, pp. 18-19.

Dhaka University Institutional Repository



মহাকুমা পর্যায়ে নামিয়ে এনে একজন সহকারী কমিশনারের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করা হয়। যার পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হলেন বিভাগীয় কমিশনার। ১৯০০ সালে এই অঞ্চলকে আবার জেলায় পরিণত করা হয় এবং পুরাতন তত্ত্বাবধায়ক পদবি ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। সীমানা পরিবর্তন করে পূর্বদিকে 'ভেমপিরি' অঞ্চলসহ কিছু অংশ লুসাই পাহাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। রাজস্ব আদায় ও নিজ এলাকার গ্রামগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব উপজাতীয় প্রধান বা চীফদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।[১৪]

১৮৭০ সালে তৎকালীন শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন লুইন চাকমা রাজ্যের উত্তরাংশ পৃথক করে পৃথক মং সার্কেল এবং চাকমা রাজ্যের দক্ষিণাংশ পৃথক করে পৃথক বোমাং সার্কেল সৃষ্টি করেন। জেলার শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন কল্পে ব্রিটিশ সরকার মৌজা বিভাগের সাথে সাথে হেডম্যান ও রোয়াজা পদ সৃষ্টি করে তাতে মৌজার অধিবাসীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি কুঞ্জধামাইয়ের পুত্র ক্যজচাই চৌধুরীকে নতুন মং চীফ ও বোমাং বংশের মং ক্রুকে বোমাং চীফ উপাধিতে ভূষিত করেন। কালিন্দী রাণী ক্যাপ্টেন লুইনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করেন। কিন্তু আপীল নাকচ করা হয়। ১৮৮১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। বস্তুত কালিন্দী রাণী অত্যন্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ ইংরেজদের সাথে অতীতে চাকমা রাজাদের বহুবার যুদ্ধ হয়েছিল। ক্যাপ্টেন লুইন চাকমা রাণীর দর্প চূর্ণ করার জন্য তার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিতেন। ১৮৬০ সালের আগে কাউকেই কর্ণফুলী নদীর শুল্ক দিতে হত না। ১৮৭১ সালে ক্যাপ্টেন লুইন জলকর দাবী করেন। অবশ্য এ প্রেক্ষিতে চাকমা রাণীকে না ক্ষেপিয়ে বরং তাকে পক্ষে রাখার কুট কৌশল স্বরূপ জলকরের অর্ধেক টাকা রাণী কালিন্দীকে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্ণফুলী নদীর বাণিজ্য করের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালের ২১ শে আগষ্ট বঙ্গীয় সরকার পরিবার প্রতি ৪ টাকা জুমকর নির্ধারণ করেন। ১৮৭৪ সাল থেকে 'জুম' রাজস্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালে ইংরেজদের লুসাই অভিযানে সহায়তা করার জন্য কালিন্দী রাণী তার দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ১৮৯১-৯২ সালে লুসাই পাহাড় ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী ব্রিটিশ সরকার সমস্ত অফিস আদালত চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙামাটিতে স্থানান্তর করেন। ১৮৩৭ সাল থেকে বিচারালয়ে ফার্সির বদলে ইংরেজী চালু করা হয়। ১৮৭৩ সালে কালিন্দী রাণীর মৃত্যু হলে তার দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্র রাজা হন। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সমতলভূমিতে চাষের কর ছিল না। পরে তা চালু করা হয়। ১৮৯০ সালে চাকমা সার্কেল ৯টি তালুকে বিভক্ত করা হয়। পরে এই ব্যবস্থা রহিত করে ১২৪ টি মৌজায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিমৌজা দেড় বর্গমাইল থেকে ২০ বর্গমাইল পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়।[১৫]

---

১৪. *Ibid.*
১৫. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository



সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশশাসন প্রত্যক্ষ রূপ নেয়। কারণ ইংরেজরা এ অঞ্চলে আসার পর বুঝতে পারে যে এই সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জন্য স্বতন্ত্র এলাকা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তাই ১৮৬০ সালের রেগুলেশন সংশোধন করে পাহাড়ী জাতিসত্তা গুলোর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালের ১লা মে Notification - 123 P.D. Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 Act. জারি করে। ১৯২০ ও ১৯২৫ সালে এই ম্যানুয়েল সংশোধনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তার নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে নতুন নীতি সংযোজিত হয়।[১৬] এই রেগুলেশন প্রবর্তন করে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতিতে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি বহির্ভূত এলাকা বা Excluded Area এর মর্যাদা দেয় এবং রাজস্ব ও সামাজিক বিচারের ভার রাজা ও অধীনস্থ হেডম্যানদের উপর আরোপ করা হয়। তাঁরা প্রশাসনিক ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রাখতেন। এই ম্যানুয়েল অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা, বোমাং ও মং সার্কেল নামে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক মৌজার সার্বিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য হেডম্যান নিযুক্তির ব্যবস্থা ছিল। আর প্রতিটি পাড়ার কার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একজন কার্বারী। এই ম্যানুয়েল ইংরেজ শাসনামলে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এই ম্যানুয়েলের মাধ্যমে Stamp ও Income Tax মওকুফ সহ অনেক প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তা সমূহের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, জমির অধিকার প্রভৃতি নিশ্চিত হয়।

**১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন এবং এর কার্যকারিতা:**

বলা হয়ে থাকে ১৯০০ সালের CHTS Regulation Act. এর কতিপয় ধারা আসলেই প্রত্যক্ষভাবে পাহাড়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের রক্ষাকবচ স্বরূপ ছিল। এ রেগুলেশন অনুসারে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় অন্যান্য জেলার শাসন ব্যবস্থা থেকে এই তিনটি পার্বত্য জেলার শাসন ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। এ রেগুলেশন অনুসারে ডেপুটি কমিশনার একাধারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিভাগীয় বনকর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, দেওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা। পাকিস্থানের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দেওয়ানী (সহকারী জজ) ক্ষমতা ব্যতীত উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ ডেপুটি কমিশনারের কার্যাবলী হতে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তিত হওয়ার ৯০ বছর পরও উপজাতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশেষত: রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা পার্বত্য

---

১৬. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা; ১৩৯২ বাংলা, পৃষ্ঠা ১৮

Dhaka University Institutional Repository



অঞ্চলের বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে তা বলবৎ রাখার দাবী জানালে এই শাসনবিধির বিচার বিশ্লেষণ এখন একটি জরুরী প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 Act মূল আইন এবং উক্ত আইনের ক্ষমতা বলে প্রণীত বিধিমালাকে একত্রে সাধারনভাবে Hill Tracts Manual বলা হত এবং এ নামেই আইনটি সমধিক পরিচিত। এই ম্যানুয়েলের মোট পাঁচ অধ্যায়ে ২০ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩-৪ নং অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যার মধ্যে কিছু কিছু আইন পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ৫-১০ নং অনুচ্ছেদে কর্মকর্তা নিয়োগ, তাদের বিচার সংক্রান্ত এবং অন্যান্য কিছু ক্ষমতার উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ১১-১৫ নং অনুচ্ছেদে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত লাইসেন্স বিষয়ে বিধিব্যবস্থার উল্লেখ আছে। পঞ্চম অধ্যায়ের ১৬-২০ নং অনুচ্ছেদে পুলিশ প্রশাসন, মামলার আপীল নিস্পত্তি, বিধিপ্রণয়ন, ক্ষমতা, উকিল নিয়োগে বিধিনিষেধ এবং দেশে তৎকালে প্রচলিত কোনো কোনো আইন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলায় রহিত করা হয়েছে। Hill Tracts Manual এর ১-১১ নং বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার পদ্ধতি ১২-৩৩ নং বিধিতে দলিলাদি রেজিষ্ট্রেশন, ৩৪ নং বিধিতে জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর পদ্ধতি, জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ, ৩৫-৪১ নং বিধিতে সার্কেল, মৌজা বিভাগ, মৌজা হেডম্যান নিয়োগ পদ্ধতি, মৌজার ও উপজাতি প্রধানের বিচার ক্ষমতা, খাজনা আদায়, ৪২ নং বিধিতে জুম কর, ৪৩ নং বিধিতে জুম কর আদায়, ৪৫ নং বিধিতে শন, গর্জন, খোলা ইত্যাদি কর আদায়, ৪৬ নং বিধিতে হেডম্যানের ভাতা, ৪৭ নং বিধিতে উপজাতীয় প্রধানদের খাস মৌজা রাখা, ৪৮ নং বিধিতে মৌজা হেডম্যান নিয়োগ ও বরখাস্ত এবং ৫০-৫৪ নং বিধিতে কতিপয় বিষয়ে ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৩৪ নং ধারায় অন্য জেলার লোককে জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১৮] ৩৫ নং বিধিতে তিন উপজাতি প্রধানের ৩টি সার্কেল, সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং মাইনী ভেলী একটি বিভাগে ভাগ করা হয়। পরে অবশ্য ১৯২৬ সালের ১৭ই জুনের সংশোধনী বলে মাইনী ভেলী বিভাগ বাদ দেয়া হয়। ৩৮ নং বিধিতে ডেপুটি কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল ও বোমাং সার্কেল এর তিন প্রধানের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

---

১৭. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০

১৮. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p. 55.

Dhaka University Institutional Repository



এই উপদেষ্টা পরিষদ নিজ নিজ সার্কেলের অধীন মৌজায় হেডম্যানদের মাধ্যমে খাজনা আদায় এবং এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা, জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি, ৪০ নং বিধিতে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিশেষতঃ নিজ নিজ সামাজিক প্রথা অনুসারে সামাজিক বিরোধসমূহ বিচার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। উক্ত বিধি বলে সার্কেল প্রধান এবং মৌজা হেডম্যানদেরকে কিছু কিছু ফৌজদারী অপরাধ বিচারের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে। ৫০ নং বিধিতে বন্দোবস্ত ছাড়া ৩০ শতাংশ জমি বাস্তুভিটা হিসেবে দখল করার অধিকার উপজাতীয়দের প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার ৫১ বিধিবলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির অবস্থানকে যদি বিপদজনক মনে করেন তাহলে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এই জেলা থেকে বহিস্কার করতে পারেন।

এভাবে Chittagong Hill Tracts Manual পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয়দের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে এই ম্যানুয়েল সর্বদিক থেকে না হলেও অনেকাংশে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পেরেছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের শাসনবিধি বলবৎ থাকার কারণে গ্রাম, ইউনিয়ন, জেলা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাজ করার সুযোগ লাভ করতে পারেনি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাপক জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশসমূহের আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বপ্রথম সফলভাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে।[১৯]

১৯০০ সালের ম্যানুয়েল পার্বত্য এলাকাকে একটি বিশেষ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে এক ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করে। একটি বিশেষ এলাকার শাসক হিসেবে ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভালমন্দের দিকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিশেষ নজর দিতে বাধ্য কিন্তু তিনি তার কোন কাজের জন্য স্থানীয় কোন প্রতিনিধি বা জনগণের কাছে দায়ী নন। তিনি তার যে কোন কাজের জন্য সরাসরি জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী। অবশ্য পরে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং পার্বত্য অঞ্চলে এক ব্যক্তির শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে স্থানীয় সরকার নামে সীমিত স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

---

১৯. Kamruddin Ahmed, *A socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*.

Dhaka University Institutional Repository



মোঘল শাসনামলে চাকমা রাজারা ছিলেন করদ রাজন্যবর্গ। চাকমা রাজারা রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তাই মোঘল শাসনামলে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হলেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে কোন বড় ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সুচতুর ইংরেজ শাসকরা তাদের আগেকার স্বাধীন সত্তা বহাল রাখার নিমিত্তে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act. জারি করে পরিস্থিতি সামাল দেন। এতে ফুঁসেওঠা অসন্তোষ ধীরে ধীরে থেমে যায়। অতঃপর আর কোন বড় ধরণের বিদ্রোহ বা অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হয়নি চতুর ব্রিটিশ সরকারকে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক হওয়ার কারণে তাদের জন্য আলাদা শাসনব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ায় ১৯০০ সালের রেগুলেশনে পাহাড়ী জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমির অধিকার, বিচার, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি ছিল। সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারকে একক ক্ষমতা দেয়া হলেও সে সময় তাদের কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি না থাকায় তাঁরা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন।[২০] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act. এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881
অনুযায়ী পাহাড়ীদের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল যা পাহাড়ীদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিল।

বর্তমান বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে তার সূত্রপাত ব্রিটিশ আমলে হলেও Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act. এর কতিপয় ধারা ছিল প্রত্যক্ষভাবে উপজাতিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। ফলে তখন থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোনো গোলযোগ দেখা যায়নি। একারণে ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলন ও তেমন সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বপ্রথম সংগঠন 'চাকমা যুবক সমিতি'। শুরুতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবর্জিত থেকে কেবল শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে গঠিত হলেও পরবর্তীতে জাতীয় জাগরণের বীজ এই সমিতির মাধ্যমেই বপন করা হয়। ১৯১৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত 'চাকমা যুবক সংঘ' স্বল্প মেয়াদের হলেও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এর অবদান অপরিসীম। ১৯২০ সালে তৎকালীন

২০. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p. 55.

Dhaka University Institutional Repository



নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'।[২১] এই সংগঠনেও প্রথম দিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়নি। দীর্ঘ উনিশ বছর পর্যন্ত শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজের সাথেই এটি ব্যাপৃত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে যামিনী রঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমা এ নেতৃত্ব গ্রহণ করলে এটিতে রাজনৈতিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাস বলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'ই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতির ইতিহাসে মাইলস্বরূপ। 'জনসমিতি'ই তৎকালীন সামন্ত প্রভু, তাঁবেদার ও ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের শাসন-শোষণ এবং অত্যাচার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে থাকে এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির বিপরীতে নব্য-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের প্রগতিশীল রাজনীতিতে নিয়ে আসার শুভ সূচনা ঘটায়। ১৯৩৯ সালে রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎচন্দ্র তালুকদার ও সুনীতি জীবন চাকমার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে আর একটি সংগঠন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি'। এটি মূলতঃ রাজকীয় আনুকূল্যে থেকে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার, ছাত্রদের মধ্যে নীতিজ্ঞান প্রচার ও ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা প্রসারের জন্য কাজ করে যায়।

**ব্রিটিশ আমলে উপজাতীয়দের আন্দোলন**[২২]

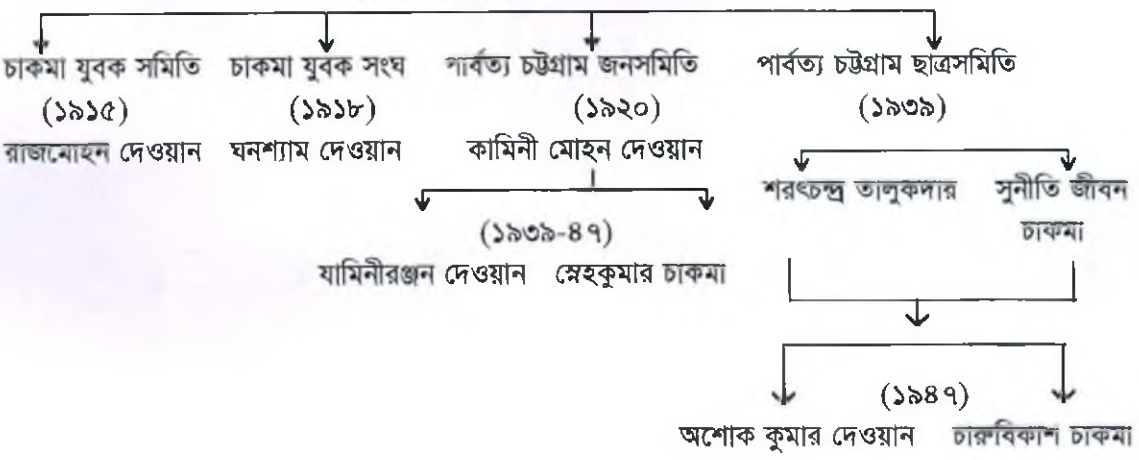


২১. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, pp.20-21.

২২. *Ibid.*, pp. 111.

Dhaka University Institutional Repository



## ৪.৩ পাকিস্তানী আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্থান ও ১৫ ই আগষ্ট ভারত নামে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে এক স্বতন্ত্র স্থান লাভ করে। যদিও পরবর্তীতে ভারত বিভক্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফর্মুলার অসাড়তা প্রমাণিত হয় এবং এটি যে একটি নিছক রাজনৈতিক কুটকৌশল তার রূপ বেরিয়ে আসে। 'Bengal Boundary Commission' এর ১৯৪৭ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের স্কেচ ম্যাপসীট অনুযায়ী পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমার পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তির কথা ছিল ভারতের সাথে। কিন্তু পরবর্তীতে Major Billy Short এর সুপারিশক্রমে র‍্যাডক্লিফ ও মাউন্ট ব্যাটেন ৯ই আগষ্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে জিরা ও ফিরোজপুর মহকুমার পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৩] এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৯৭ % অমুসলিম, ভিন্ন ভাষাভাষী ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামে 'Chittagong Hill Tracts People's Association' প্রকাশ্যে ও সরকারীভাবে রাঙামাটিস্থ জেলা প্রশাসকের অফিসে ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ২০ শে আগষ্ট পর্যন্ত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করে।[২৪] অনুরূপভাবে বোমাং সার্কেলের রাজ পরিবারের নেতৃস্থানীয় কয়েক ব্যক্তিও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বান্দরবানে বার্মার (মায়ানমার) পতাকা উত্তোলন করে। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের ২১ শে আগষ্ট পাকিস্থানের বেলুচ রেজিমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের পতাকা নামিয়ে পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন করে। তিনজন উপজাতীয় প্রধান পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি 'Native State' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতি দাবী জানিয়েছিলেন। এসব দাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তারা ত্রিপুরা, কুচবিহার ও মেঘালয় সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।[২৫] এরপর পাকিস্থান সরকার ঢালাওভাবে উপজাতীয়দের প্রো-ইণ্ডিয়ান বা ভারতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্থানের সাথে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তৎকালীন নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ভারতপন্থী অধিবাসীরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে এবং

---

২৩. প্রদীপ্ত ঈসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩৩

২৪. *An Account of Chittagong Hill Tracts*, Jana Sanghati Samity, 14 July, 1982, pp. 3-4.

২৫. Syed Nazmul Ahasan & Bhumitra Chakma, "Problems of National Integration in Bangladesh: The Chittagong Hill Tracts", *Asian Survey*, Vol. 29, No. 1, October, 1989.

Dhaka University Institutional Repository



বার্মাপন্থীরা বার্মায় চলে যায়। উক্ত পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনার জন্যভারত ও বার্মা (মায়ানমার) পাকিস্থানের কাছে অনুরোধ রাখে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক চাপ এড়ানোর জন্য পাকিস্থান সরকার ১৯০০ সালের রেগুলেশন বলবৎ রাখলেও কার্যতঃ বিশেষ জেলার মর্যাদা তুলে নেয়। ফলে উক্ত রেগুলেশন অর্থহীন হয়ে পড়ে। দেশ বিভাগের পর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় পরবর্তীতে শাসনকার্য পরিচালনায় পাকিস্তানীদের মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল' অনুসারে অক্ষুন্ন রাখা হয় এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এ অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা রহিত করা হয়। এতে পার্বত্যবাসীর মনে ভয়, সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। স্বকীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির হেফাজত সম্পর্কে নতুন ভাবনা সমস্যার দোলায় দুলতে থাকে।

পাকিস্থান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কোন রকম মতামত না নিয়েই 'বিশেষ এলাকার মর্যাদা' বাতিল করে দেন। এভাবে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার উপজাতীয়দের স্বাধীন জীবনে ছন্দপতন ঘটালেন। পকিস্থান সরকারের আমলাতান্ত্রিক ও নিপীড়ণমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না পেরে বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় মানুষ চিরকালের জন্য জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মায় আশ্রয় নেয়। ১৯৬৪ সালে প্রায় ৫০ হাজার উপজাতি নরনারী ভারতে যান এবং ৩০ হাজার চলে যান বার্মায়।[২৬] এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরকে 'বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা' দেয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে আইনসভার সম্মতি ব্যতিরেকে পার্লামেন্টে তার সীমানা পরিবর্তনের কোন বিল উত্থাপন করা যাবেনা। বহিরাগতদের সম্পত্তি অধিকার ও সীমিত করা হয়েছে। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালে 'Chittagong Hill Tracts Frontier Police Regulation 1881' এর মত একটি বিশেষ বাহিনী পাকিস্থান সরকার বাতিল করায় পাহাড়ী জনগণ বুঝতে পারেন তাদের উপর বিমাতাসুলভ আচরণের প্রদর্শন শুরু। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে পাকিস্তানীরা পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করে।[২৭] যে 'Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 Act.'কে পাহাড়ী জনগণের রক্ষা কবচ হিসেবে বলা

---

২৬. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, p.36.

২৭. বিপ্লব চাকমা. *op. cit.*, p.56.

Dhaka University Institutional Repository



হত। পার্বত্য জাতিসত্তা সমূহের নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিসহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে যে বিধি ব্যবস্থা একটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল পাকিস্থান আমলে তা পদদলিত হয়। উক্ত রেগুলেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, পার্বত্য চট্টগামে জমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা যা ৩৪ নং বিধি বলে ডেপুটি কমিশনারের উপর অর্পণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ১৫ বছর বসবাসরত ভূমিহীন বহিরাগত লোকদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার উক্ত ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দা নির্ধারণে সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে বহিরাগত বাঙালী ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির মালিকানা লাভের পথ সুগম করে দেয়। প্রধানত এই সংশোধনীর পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙালীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৫১ নং ধারানুসারে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা নয় এই মর্মে কোনো ব্যক্তির অবস্থানকে যদি বিপদজনক মনে করেন তাহলে পাহাড়ী জনগণের জীবনধারার স্বার্থ-বিরোধী হিসেবে তাকে গণ্য করে অবাঞ্চিত ঘোষণা করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বহিস্কার বা প্রবেশ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। উক্ত আদেশ লংঘনের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড সহ দু'বৎসরের কারাদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডের বিধান রয়েছে। মূলতঃ পাহাড়ী উপজাতীয়দের অধিকারকে সংরক্ষণ ও অন্য জেলা থেকে এ জেলায় বসতি স্থাপনে বাধাদানের জন্য এ বিধি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্থানের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্থান হাইকোর্ট মোস্তফা আনসারী বনাম ডেপুটি কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম গং মামলায় উক্ত বিধিকে বে আইনী ঘোষণা করায় তা রহিত হয়ে যায়।[২৮]

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় আনে আমূল পরিবর্তন। এই বাঁধ নির্মাণ করার ফলে জনগণের জীবনে নেমে এসেছিল অভাবনীয় দুঃখ দুর্দশা। কিন্তু সে সময় কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলনা বলে এই বাঁধের বিরুদ্ধে তেমন ধরনের কোনো বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধুমাত্র এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিপুল সংখ্যক উপজাতির দেশত্যাগ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউ. এস. এইডের ঋণের টাকায় ৫ বছর ধরে রাঙামাটিতে বাস্তবায়ন করা হয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প। এতে এ অঞ্চলের মোট আবাদি জমির শতকরা ৪০ ভাগ (প্রায় ৫৫ হাজার একর জমি) সহ ২৫০ বর্গমাইল অঞ্চল জলমগ্ন হয়। প্রায় ১ লাখ চাকমা ও অন্যান্য জাতিসত্তার

---

২৮. 17 D. L. R. (1965), pp. 553-563.

Dhaka University Institutional Repository



মানুষ (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ৬০ হাজার কোন রকম ক্ষতিপূরণ পায়নি। ৫ কোটি ৯০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার কথা থাকলেও দেয়া হয় মাত্র ২৫ লাখ ডলার। পাহাড়ীদের ঐতিহ্যগত জুমচাষ পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রকল্প এ অঞ্চলের জনগণের জীবন জীবিকা ও অঞ্চলের সামগ্রিক পরিবেশের উপর একটি বড় আঘাত এনে দেয়। এর পরপরই ১৯৬৬ সাল থেকে পরিকল্পিত ভাবে বাঙালী পুনর্বাসন শুরু হয়। একদিকে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও অন্যদিকে পরিবেশগত হামলা সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে চরম অস্তিত্বের সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে।[২৯] এভাবেই পাকিস্থান আমলে জাতিগঠন সংক্রান্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। কিন্তু তৎকালীন শাসকচক্র পাহাড়ী উপজাতিদের এই দুঃখ দুর্দশার প্রতি ঘুণাক্ষরেও সুদৃষ্টি না দেয়ায় সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী ১১ দফার আন্দোলনে পাহাড়ী ছাত্ররা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সর্ব প্রথম যোগদান করে। নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে নিজেদেরই মূল ভূমিকা রাখতে হবে এই বোধোদয় পাহাড়ীদের মধ্যে জাগ্রত হতে থাকে।

কাপ্তাই বাঁধ পরবর্তী ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনে অব্যস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা ও প্রতিবাদ জানানো এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের ১৮ই জুন চট্টগ্রামে এম. এন. লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ট্রাইবাল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন'। উপজাতীয় জনগণের মধ্যে একটি প্রগতিশীল জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা অনন্তবিহারী খীসা এবং জে. বি. লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি' (Chittagong Hill Tracts Tribal Welfare Association)।

এই পরিষদের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে গঠিত হয় 'নির্বাচন পরিচালনা কমিটি' এবং উথাপন করা হয় ১৬ দফা দাবীনামা। এতে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী ছিল অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি উথাপিত হয়। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি'র নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতৃত্বে তৎকালীন পাকিস্থান গণপরিষদে এম. এন. লারমা আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে তারা রাজতন্ত্রকে সরাসরি আঘাত না করে রাজা ত্রিদিব রায়ের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। এটি ছিল

---

২৯. বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত, *পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৯

Dhaka University Institutional Repository



মানবেন্দ্র লারমার কৌশলগত বিজয়। ১৯৭০ সালের ১৬ ই মে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত হয় 'রাঙামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি'। এর প্রথম এডহক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম. এন. লারমা, জেবি লারমা, ভবতোষ দেওয়ান, যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, অমিয়সেন চাকমা ও কালীমাধব চাকমা প্রমূখ নেতা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এই পার্বত্য সংগঠন কোনরকম প্রচার না পাওয়ায় গোপন সংগঠন রূপেই থেকে যায়।[৩০]

পাকিস্থান আমলে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক সংগঠন [৩১]

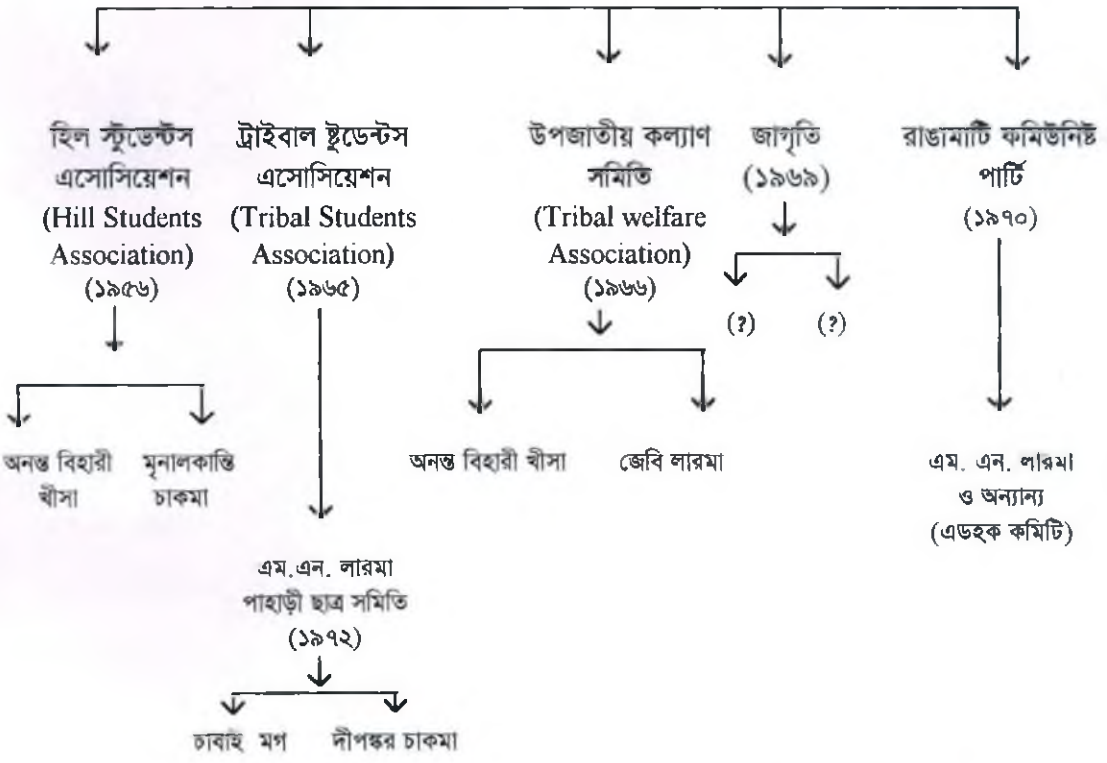


১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি এবং তাদের দাবী দাওয়া ও পাকিস্থান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ সহ নানান সংকটসমূহ বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। উপরন্তু এই সংকট ক্রমাগত অবনতির দিকে যেতে থাকে । এ প্রসঙ্গে আহমদ

---

৩০. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, p.37.

৩১. *Ibid.*, p.111.

Dhaka University Institutional Repository



মুসার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন- "তথাকথিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট ফ্যানাটিক রাষ্ট্র পাকিস্থানে জাতীয় সংখ্যালঘুরা অধিকার বঞ্চিত হবেন, এটি খুবই সুত্রাবদ্ধ বিষয়। কিন্তু উপজাতীয়দের উপর সেই নির্যাতন ও শোষণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত"।[৩২]

**৪.৪ যাংলাদেশ আমল : মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫)**

পাকিস্থান সরকারের ভারত বিরোধী মনোভাবের কারণে তার প্রভাব হিন্দু সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহের উপর পড়ে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্বল আইন শৃংখলা পরিস্থিতির কারণে এবং আওয়ামী লীগের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে উপজাতিদেরকে সুসংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রবলস্রোতে পাহাড়ী জনগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সঠিক পন্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকভাবে উপজাতিরা বিভিন্ন অস্ত্র চালনায় পারদর্শী জেনে পাকিস্থান সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সুকৌশলে তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য লোভ কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনেও কার্পণ্য করেনি। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ রাজা ত্রিদিব রায়কে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কাজে ব্যবহার করেন। তৎকালীন স্পর্শকাতর ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা না হওয়ায় রাজা ত্রিদিব রায় দেশান্তরিত হন। তিনি চীন হয়ে পাকিস্থানে চলে যান এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। পরে তিনি জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন।[৩৩] এছাড়া তৎকালীন পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ উপজাতীয় তরুণদের নিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করেন। পাকিস্থানের সামরিক কমাণ্ডাররা রাজাকার এবং সিএএফ এ নেয়ার জন্য বিভিন্ন উপজাতীয় গ্রামের চেয়ারম্যান হেডম্যান, ও কার্বারীদের বাধ্য করেছিল তাদের চাহিদা মতো উপজাতীয় লোকজনের যোগান দিতে। অপর দিকে পাহাড়ী জনতার এক অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে ভারতে গমন করে। তাঁদের মধ্যে অশোক মিত্র চাকমা (বর্তমানে 'জনসংহতি সমিতি'র একজন রাজনৈতিক কর্মী), নববিক্রম ত্রিপুরা (বর্তমানে এস. পি), ঔক্যজাই মারমা (বর্তমানে ভিসি), মনীষ দেওয়ান (সেনাবাহিনীর মেজর), দীপঙ্কর তালুকদার (বর্তমানে এম. পি) ও মেজর রক্সি (সাবেক শান্তিবাহিনীব কমাণ্ডার) সহ আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রয়াত মং চিফ মং প্রুসাইন মুক্তিযুদ্ধের সময় অনারারি কর্ণেল ব্যাচ ধারণ করে আখাউড়া রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

---

৩২. আহমদ মুসা, "শান্ত-অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম", মাসিক *নিপুন*, জুন, ১৯৮৫

৩৩. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪৬

Dhaka University Institutional Repository



উপজাতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব এবং সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ উপজাতি গ্রামে অগ্নিসংযোগ এবং উপজাতি নিধনের ন্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা পানছড়িতে ১৬ জন উপজাতিকে হত্যা করলে দিঘীনালা ও বরকল এলাকাতে নির্যাতন মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়।[৩৪] উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় জড়িয়ে পড়া এবং কারো কারো ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের উপজাতি বিরোধী তৎপরতার জন্য কিয়দংশে দায়ী। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী বা পাকিস্তানীদের সহযোগীতাকারী উপজাতিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রক্ষিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধার করার নামে কিছু কিছু উপজাতীয় গ্রামে এাসের রাজত্ব কায়েম করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে উপজাতিদের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, অবিশ্বাস ও উৎপীড়ণের প্রতিবাদে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সালের ২৪ শে জুন রাঙামাটিতে গঠন করেন '*পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি*' নামে এক রাজনৈতিক সংগঠন। এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে '*পাহাড়ী ছাত্র সমিতি*' নামে একটি ছাত্র সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব নামে জনপ্রিয়) এর কাছে চার দফা দাবী পেশ করে। দাবীগুলো হচ্ছে :

১) Autonomy for the Chittagong Hill tracts and the establishment of a special legislative body. (পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।)

২) Retention of the regulation of 1900 in the new constitution of Bangladesh. (উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির' অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।)

৩) Continuation of the offices of the tribal chiefs; (উপজাতীয় রাজাদের দফতর সংরক্ষণ করা হবে।) এবং

---

৩৪. Syed Nazmul Ahasan & Bhumitra Chakma, "Problems of National Integration in Bangladesh: The Chittagong Hill Tracts", *Asian Survey*, Vol. 29, No. 1, October, 1989.

Dhaka University Institutional Repository



৪) A constitutional Provision restricting the amendment of the regulation of 1900 and imposing a ban of Bengali settlement in CHT.[৩৫] (সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা)।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করে সরাসরি দাবীগুলো প্রত্যাখান করেন। তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের মধ্যে মিশে যেতে পাহাড়ীদের উপদেশ দেন। এই উপদেশ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর চরম অবজ্ঞা। দেশগঠন ও জাতীয় সংহতি অর্জনের পথে শেখ মুজিবের এই সিদ্ধান্ত ছিল বৈপরিত্যে পরিপূর্ণ। হাজার বছরের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে, এদেশের মাটি আর বাতাসের সাথে সবাই যে সমান ভাবে সম্পৃক্ত তা ভাল করে পাহাড়ীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বুঝানো হয়নি, যার ফলে পাহাড়ীদের মধ্যে বাঙালী সত্তা সম্পর্কে একটি ভয় এবং অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। এদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও তারা যে বাঙালীদের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব নয় এ ধারণা এবং সম্পৃতির ভাবাবেগ তাদের মধ্যে সরকারীভাবে বুঝানো হয়নি বলেই তৎকালীন সরকারের আন্তরিকতাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। ১৯৭২ সালের ২৯ শে জানুয়ারী চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন যে সরকারী চাকুরীতে আদিবাসীদের ন্যায্য অংশ প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। আদিবাসীরা তাদের ভূমির অধিকার পূর্বের মত ভোগ করতে পারবেন।[৩৬]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণ পরিষদের এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বৃহত্তর বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন, "এ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের কথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণ ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমল থেকে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে আমাদের জাতিসত্তার কথা ভুলে যাওয়া

---

৩৫. আজিজুল হক, "বাংলাদেশ ইন ১৯৮১ : স্ট্রেইনস্ এন্ড স্ট্রেস", *এশিয়ান সার্ভে*, ভল্যুম ২১, নং ২

৩৬. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৯

Dhaka University Institutional Repository



হচ্ছে। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করতে চাই। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিসত্তার স্বীকৃতি রয়েছে। আমি সংবিধানে উপজাতীয় জনগণের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"[৩৭]

যে কোন দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মনে বিশ্বাস ও সংহতির বীজ বুনতে হলে প্রয়োজন সুষ্ঠু জাতীয় নীতি এবং জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নীতিমালার রূপায়ণ।

১৯৭৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ এক ভাষা ও এক সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র'- এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এর স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "I am a chakma. A Marma can never be a Chakma, A Chakma can never be a Bengali ..... I am a Chakma. I am not a Bengali. I am citizen of Bangladesh-Bangladeshi. You are also Bangladeshi but your national identity is Bengali ..... They [tribal] can never be Bengalis."

তিনি আরও বলেন, "our main worry is that our culture is threatened with extinction. But we want to live with our separate identity."[৩৮]

১৯৭২ সালের ১৭ই জুলাই স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'লাল পতাকা'র কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন: "প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন করেছেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি পাকিস্থানের সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের ন্যায় সংগ্রাম দমনের নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ দমননীতি প্রতিরোধ সংগ্রামের শক্তি বাড়াবে।"[৩৯]

কৃষক সমিতির জনৈক কর্মীর এক বিবৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন বিরোধী ভূমিকা তাদের নীতি ও আদর্শগত দেউলিয়াপনার স্বরূপ উদঘাটন করেছে।

---

৩৭. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, pp.99

৩৮. Dr. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story*, Centre for Development Research, Bangladesh (CDRB), 1992, P. 110.

৩৯. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, p. 43.

Dhaka University Institutional Repository



এটি তাদের জন্য মৃত্যুবান হবে। লেনিনবাদই জাতি সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ-নির্দেশক। ভারত সাড়ে তিন লাখ মিজোর জন্য মিজোরাম গঠন করেছে। বাংলাদেশে ৬ লাখ উপজাতির জন্য স্বায়ত্বশাসন অযৌক্তিক হতে পারে না।"[৪০]

১৯৭৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাঙামাটিতে এক নির্বাচনী সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন, "আমরা এখন সবাই বাঙালী। এখানে কোন উপজাতি নেই। আমি আজ থেকে আপনাদেরকে উপজাতি থেকে জাতিতে প্রমোশন দিলাম।"[৪১] এই ঘোষণার সাথে সাথে শিক্ষিত পাহাড়ীগণ প্রতিবাদ মূখর হয়ে ওঠে। নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই দেশটিতে জাতিগঠন প্রক্রিয়া এভাবেই ভেঙ্গে পড়ে, যার জন্য দেশগঠনও বিলম্বিত থেকে যায়।

মুজিব সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে অভিযুক্ত করে এবং তার নাগরিকত্ব বাতিল ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জুম্ম জাতির নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে সামন্তবাদী রাজনীতির বিপরীতে উত্থান ঘটে মার্কসবাদী এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবেই তিনি পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আসলে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিতর কিভাবে পাহাড়ীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে, তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। ফলে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' উপজাতীয়দের অধিকার ক্ষুন্ন করে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে- এধরনের ধারণা পোষণ করতে থাকেন উপজাতীয় জনগণ। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' নামে আর একটি নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। যা বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধবাদী স্রোতে অবস্থান নিয়ে জাতীয় সংহতি বিনষ্টের সূত্রপাত ঘটায়। শেখ মুজিবুর রহমান যেমন পাকিস্থান বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করে বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঠিক তেমনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বহিরাগত বাঙালী বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির পাতাকাতলে পাহাড়ীদের সমবেত করতে সমর্থ হন।

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'টি আসনেই জনসংহতি সমিতির প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাথোয়াই রোয়াজা যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সোমিত রায় ও জাসদের উপেন্দ্র লাল চাকমাকে বিপুলভাবে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিজয় হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে জুম্ম জাতীয়তাবাদ বিজয় অর্জন করে আর পরাজয় বরণ করে

---

৪০. *Ibid.*

৪১. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *op. cit.*, p. 52.

Dhaka University Institutional Repository



বাঙালী জাতীয়তাবাদ। '৭৩ এর সাধারণ নির্বাচন পাহাড়ীদের রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত করে।

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে উপজাতীয়রা তাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা না পেয়ে এবং সরকারী বাহিনীর বিমাতাসুলভ আচরণ, হয়রাণি, অত্যাচার ও পাশবিক নির্যাতনের প্রতিকার না পাওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রভাব খাটানোর জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' ১৯৭৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এটিকে নিছক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ফিরিয়ে দেন। সামাজিক অনাচার, অত্যাচার ও জাতিগত নিপীড়নের উপযুক্ত প্রতিকার ও ন্যায়বিচার না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যের ভাবনা নিজেরাই ভাবতে শুরু করে। আর এ লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারী গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন- 'শান্তিবাহিনী'। খুব সম্ভবতঃ চীন বিপ্লবের সফলতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন ভারতের নক্শাল বাড়ী আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদার, বাংলাদেশের সিরাজ সিকদার সহ আরো অনেক বামপন্থী নেতা। যার ফলে লারমা মাও সেতুং এর গণযুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বনে প্রলম্বিত যুদ্ধের মাধ্যমে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মুক্তির লক্ষ্যে শান্তিবাহিনী গঠন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে জনসংহতি সমিতি সামন্তবাদকে প্রধান শত্রু হিসেবে নির্ধারণ করে মাও সেতুং এর গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান কল্পে কর্মসূচী প্রদান করে। রাঙামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনসংহতি সমিতির কোনটিই মার্কসবাদী সংগঠন ছিলনা, যা তাদের দেওয়া চারদফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। চার দফা কর্মসূচীকে পাহাড়ীদের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এখানে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়নি। এমন কি তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী বুর্জোয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবীর নামান্তর। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে উপজাতিদের মধ্যকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহুলোক শান্তিবাহিনীতে নিয়োগ লাভ করে এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য গভীর অরণ্যে একটি মিলিটারী একাডেমীও প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪২] প্রাথমিক পর্যায়ে রাজাকার এবং সিএএফ দের লুকিয়ে রাখা অস্ত্র এবং নাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া গোলাবারুদ দিয়ে শান্তিবাহিনীকে সশস্ত্র করা হয়। এ সময় বার্মার কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথেও একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ভারতের 'নাগা' ও 'মিজো' বিদ্রোহীদের নিকট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে জনসংহতি সমিতির সমগ্র কার্যবলী ও শাখা সমূহের একটি ছক বিধৃত হল;

---

৪২. ফেরদৌস হোসেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা", ড. আবুল কালাম সম্পাদিত, *প্রবন্ধাবলী-৩*, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১০৯

Dhaka University Institutional Repository



## Organisation of PCJSS [৪৩]

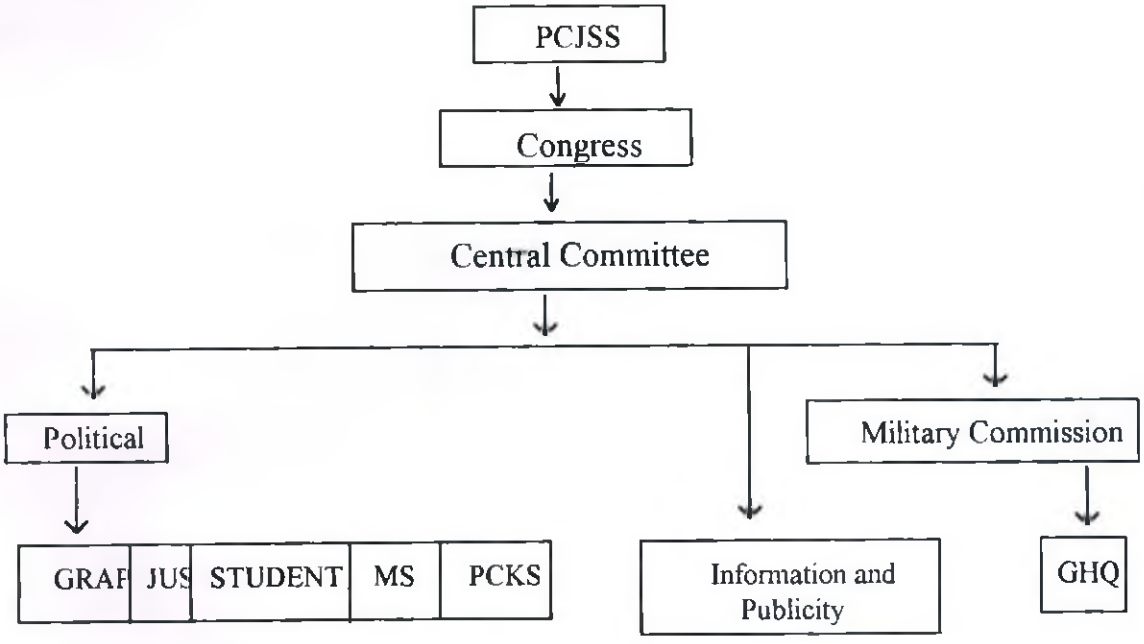


Legend

| |
|---|
| PCJSS = Parbatya Chattogram Jana Sanghati Samiti |
| GRAP = Gram Panchayet |
| JUS = Jubo Samiti |
| MS = Mahila Samiti |
| PCKS = Parbatya Chattogram Kyattanya Samiti |
| GHQ = General Head Quarters |

৪৩. Dr. Mizanur Rahman Shelley, *op. cit.*, p.112.

Dhaka University Institutional Repository



## ORGANISATION OF INSURGENT ARMED CADRE [৪৪]

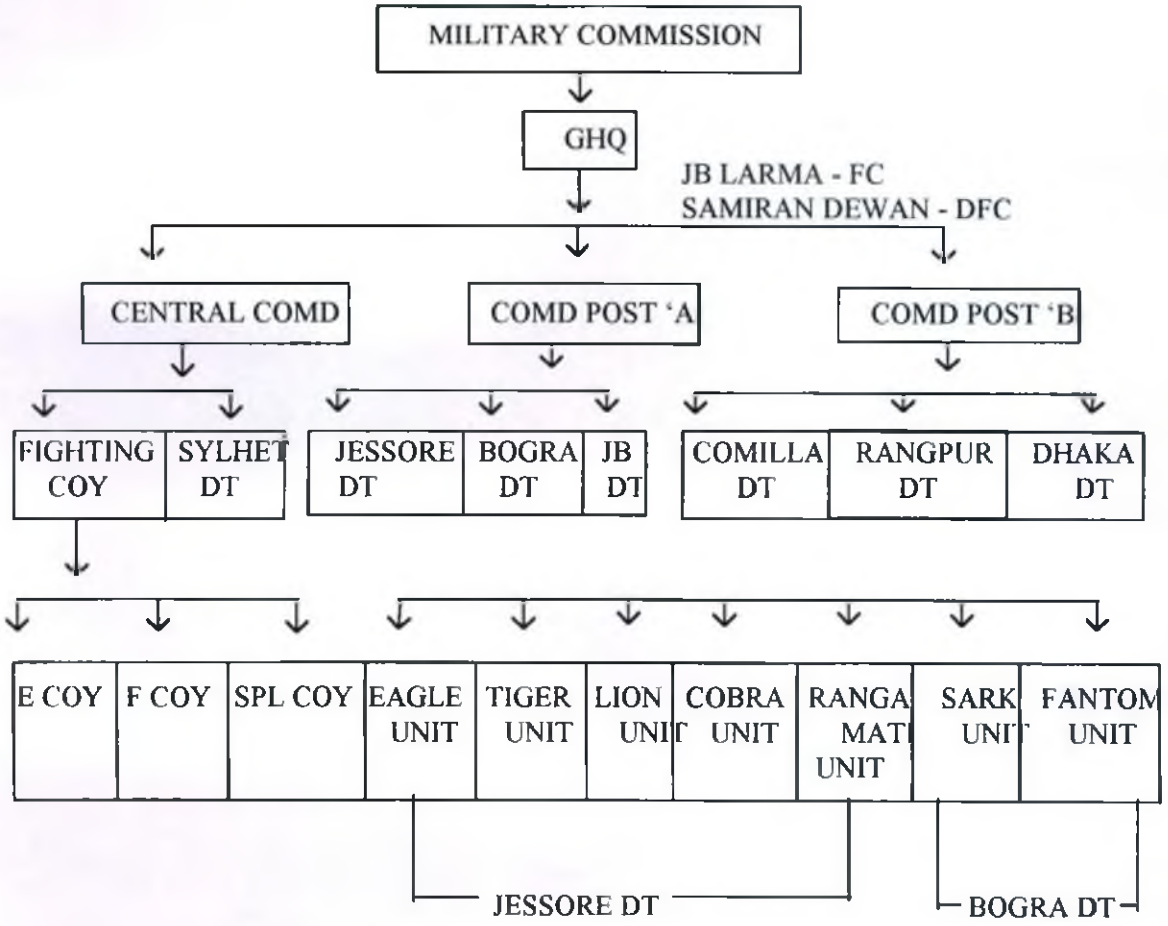


LEGEND

| |
|---|
| FC = FIELD COMMANDER |
| DFC = DEPUTY FIELD COMMANDER |
| COMD = COMMANDER / COMMAND |
| DT = DISTRICT |
| SPL = SPECIAL |
| JB = JESSORE BOGRA |
| COY = COMPANY |

৪৪. *Ibid.*, pp. 114.

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন গণদাবী ও ছাত্র দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ৯ই জুন পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ঐ স্মারকলিপিতে যেসব দাবী তোলা হয় তা নিম্নরূপ:

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের জন্য সমাজতান্ত্রিক পৃথক শাসিত অঞ্চল বা গণতান্ত্রিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল চাই।

২। কাপ্তাই বাঁধ-মরণ ফাঁদের জল আর বাড়ানো চলবে না।

৩। মাইনী এলাকার গণনির্যাতনকারী, নারী ধর্ষণকারী জল্লাদ বেনিয়া ইয়াহিয়া ও হিটলারী বাহিনীর শিষ্যদের উপযুক্ত বিচার চাই এবং গণহত্যা ও লুটতরাজ, রাহাজানি অবিলম্বে প্রতিরোধ করা হোক। এর সুষ্ঠু তদন্তের জন্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট আবেদন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অন্যায়, অত্যাচার দূর করে শোষক শোষিতের মূল্যায়ন একই মাপকাঠিতে করে সত্যিকার সমাজতন্ত্রের বিকাশ চাই।

৫। অনতিবিলম্বে পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করা হোক।

৬। অন্যায়ভাবে আটককৃত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক ।

৭। কালো বাজারীদের দমন করে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনা হোক।

৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের জন্য আরো অধিক সংখ্যক মহাবিদ্যালয়, কারিগরি মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং জনসাধারণের দারিদ্রতা হেতু অষ্টম মান পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং উপজাতীয় শিক্ষা তহবিল গঠন করা হোক।

৯। রামগড় থানার ফেনী উপত্যকার জমি বেদখলকারীদের অপসারণ করে জমির প্রকৃত মালিকদের নিকট জমি ফিরিয়ে দেয়া হোক।

১০। উপজাতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব ভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হোক।

চাবাই মগ (সভাপতি), বিশ্বকীর্তি ত্রিপুরা (সহ-সভাপতি) দীপঙ্কর চাকমা (সাধারণ সম্পাদক) স্বাক্ষরিত এই দশটি দাবী ছিল ছাত্র-জনতার দাবী-পার্বত্য চট্টগ্রামের গণদাবী। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে আশা উপজাতীয়দের মধ্যে জেগে উঠেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ শাসকগোষ্ঠী তা পূরণে সফলকাম হয়নি তাই একটি চাপা অভিমান ও ক্ষোভ তাদের মধ্যে সুপ্ত থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসার সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository



পায়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদার দাবীকে শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে মেনে না নিলেও এর একটি সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজেই বাকশালে (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) যোগ দেন।[৪৫] বাকশালে যোগদানকারী অন্যান্য সদস্যের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা অনন্তবিহারী খীসা, বামপন্থী তাত্ত্বিক মিঃ চারুবিকাশ চাকমা, প্রাক্তন ছাত্রনেতা জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং মারমা সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক নেতা কে. এস. প্রু অন্যতম। তৎকালীন বাকশাল সরকার অনন্তবিহারী খীসাকে খাগড়াছড়ি, চারুবিকাশ চাকমাকে রাঙ্গামাটি, কে. এস. প্রু-কে বান্দরবান জেলা কমিটির সম্পাদক নিয়োগ করেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হন গভর্ণর। মুজিব সরকারের শাসনামলে ভারত শান্তিবাহিনীর অপতৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্ক করে দেয়। জানা গেছে 'বাকশাল' গঠন করার পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সামরিক অভিযানের একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল সে সময়কার গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টিকে দমন। কিন্তু গোপন উদ্দেশ্য ছিল শান্তিবাহিনী এবং তখনকার দিনে পালিয়ে থাকা ভারতীয় মিজো বিদ্রোহীদের দমন করা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটায় ভারত অন্য কুটকৌশল গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যাঞ্চলে মিজো গেরিলা যেন আশ্রয় নাপায় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের সরকার যেন হুমকীর সম্মুখীন থাকে এ উদ্দেশ্যে ভারত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে আশ্রয় দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের তৎপরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে। বাকশাল সরকারের পতনে সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার কারণে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আত্মগোপন করেন।[৪৬] পরে প্রকাশ্যে আসতে চাইলেও বিরাজমান অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই সময়ে একদিকে যেমন শান্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে জিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য এলাকায় বাঙালী বহিরাগত পুণর্বাসনও পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি পায়।

মুজিব সরকার উপজাতিদের এই সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে অন্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি নতুন চাকমা রাজা ঘোষণার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রাখেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেন। আর এ লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩টি, চট্টগ্রাম

---

৪৫. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *তিন পার্বত্য জেলা*, op. cit., p.22.

৪৬. প্রদীপ্ত খীসা, op. cit., p.51.

Dhaka University Institutional Repository



মেডিকেল কলেজে ২টি, ঢাকা প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি, কৃষি কলেজে ২টি এবং পলিটেকনিকে ৫টি আসন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন।[৪৭] এছাড়াও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠনের সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৈদেশিক বৃত্তি প্রদানসহ চট্টগ্রাম ও ঢাকায় উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য বাড়ী বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়াও মুজিব সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার পর এই প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন আর অগ্রসর হয়নি। বাংলাদেশে জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু পথে এগোয়নি বলেই উপজাতীয়দের মধ্যে যে চাপা অভিমান ও হতাশার জন্ম হয় তাই পরে বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে পরবর্তী সরকার সমূহকে দেশগঠনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে।

**৪.৫ জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকাল (১৯৭৫-১৯৮১)**

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতিগঠন সমস্যায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের (জিয়া নামেই জনপ্রিয়) সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে 'রাজনৈতিক সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত না করে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। সমস্যা আর এক ধাপ অগ্রসর হয় মূলতঃ এখানেই। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের ২০ শে অক্টোবর এক অধ্যাদেশ (নং ৭৭) জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮] জন্মলগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব থাকায় এবং উপজাতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকায় জনসংহতি সমিতি একে 'আর্মি উন্নয়ন বোর্ড' নামে অভিহিত করে এসেছে।[৪৯] পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বেশ কিছু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যুগ যুগ ধরে অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য এই বোর্ড যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করে তার মধ্যে যৌথ খামার প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা ঋণদান কর্মসূচী, ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৪/৮৫-১৯৮৮/৮৯), সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কুটিরশিল্প উন্নয়ন প্রকল্প, বিশেষ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প, শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল উন্নয়ন প্রকল্প, টেলি যোগাযোগ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প, সমন্বিত জুমিয়া পুনর্বাসন এবং বনায়ন প্রকল্প, পাল্লউড উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, বান্দরবান ষ্টেডিয়াম নির্মাণ, খাগড়াছড়ি শিশু সদন নির্মাণ, শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প (বহুমুখী) উল্লেখযোগ্য। জিয়া সরকার উপজাতীয়

---

৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা, ১৭ই জুন, ১৯৭৩)

৪৮. Life is not ours- The Chittagong Hill Tracts Commission, May, 1991

৪৯. *১০ই নভেম্বর স্মরণিকা*, প্রকাশনায়: তথ্য ও প্রচার বিভাগ, জনসংহতি সমিতি, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository



মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগীতা ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে এবং জনসংহতি সমিতির বিকল্প হিসেবে ১৯৭৭ সালের ২রা জুলাই 'ট্রাইবাল কনভেনশন' নামে একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৫০] কিন্তু ট্রাইবাল কনভেনশন ইপ্সিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের 'উন্নয়ন পরিকল্পনা' সম্পর্কে পাহাড়ী উপজাতীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

তিন সার্কেলের প্রধান ও কিছু স্থানীয় নেতাদের নিয়ে বোর্ডের কন্সালটেটিভ কমিটি গঠন করা হলেও বোর্ডের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মূলতঃ তাদের কোন ভূমিকা নেই। চেয়ারম্যানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সহায়তায় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী বোর্ডের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। আমলা নির্ভর হওয়ার কারণে এই বোর্ড পাহাড়ীদের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তাঘাট, ইমারত নির্মাণ করা হলেও বোর্ড এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি যাতে পাহাড়ীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

..... *"The CHTDB was established in 1976 by the late Ziaur Rahman to fight the Shanti Bahini. It is a purely political organization to bribe the tribales. Loans are given for private purpose, to businessman and tribal leaders. .....They are showpieces of the government. Yes, it is mostly a political bribe to tribal leaders to buy them off so they would not help the shanti Bahini".* [৫১]

জিয়া সরকারের আর একটি রাজনৈতিক কৌশল জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় মারাত্মক বিপর্যয় এনে দেয়। উপজাতি বিদ্রোহ দমনে পার্বত্য অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সামরিক ও আধাসামরিক পুলিশ ও আনসার বাহিনী মোতায়েন সহ রাজস্ব আয়ের একটি বড় ধরনের অংশ সেখানে ব্যয় করা হয়।[৫২] জিয়া সরকারের দমনমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধ আক্রমণ ছিল সক্রিয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দীঘিনালায় জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় ও শান্তিবাহিনীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের প্রথমদিকে সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনী তার সামরিক এ্যাকশন কর্মসূচী শুরু করে দেয়। প্রথম দিকে কর্মসূচী ছিল থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি

---

৫০. ফেরদৌস হোসেন, *op. cit.*, p.111

৫১. Life is not ours- *op. cit.*, p.84.

৫২. আনু মুহাম্মদ, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা কোথায়?" *প্রিয় প্রজন্ম*, জানুয়ারী, ১৯৯২ সংখ্যা

*Dhaka University Institutional Repository*



আক্রমণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীতে ব্রীজ, কালভার্ট, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সুযোগমত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ করা।[৫৩] ১৯৮০ সালের মার্চের প্রথম ভাগে শান্তিবাহিনীর গেরিলা হামলায় ২২ জন সৈন্য ও ১ জন অফিসার নিহত হবার সাথে সাথে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে।[৫৪] এই ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের মত আর একটি '২৫শে মার্চ' নেমে আসে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী থানাধীন কমলপতি ইউনিয়নের পাহাড়ী জনগণের উপর। স্থানীয় পোয়াপাড়া বৌদ্ধ মন্দির মেরামত করার ছলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে হাজির করিয়ে ক্যাপ্টেন কামাল উপস্থিত সবার উপর অতর্কিত গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ প্রদান করে। এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় তিন শতাধিক বৌদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।[৫৫] আর প্রকাশ্য দিবালোকে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ও প্ররোচনায় পুনর্বাসিত বাঙালী কর্তৃক হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী জ্বালানো, মন্দির লুণ্ঠন ও ধর্ষণের কাহিনী ছিল করুণ ও বর্ণনাতীত। কমলপতির হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ আমলে জেনারেল ডায়ার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর সরকার সংসদে কমলপতি গণহত্যার তদন্ত না চেয়ে শুধুমাত্র নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেয়। অন্যদিকে তিনজন বিরোধী দলীয় সদস্য শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি সরকারকে উপজাতীয়দের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান সম্বলিত নিম্নলিখিত ছয়টি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।[৫৬]

১) বেসরকারী প্রশাসনের স্বার্থে সেনাবাহিনীর অপারেশন বন্ধ।

২) উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বার্থে অবিলম্বে আলোচনা করা এবং কমলপতি সহ অন্যান্য ঘটনার তদন্ত, বিচার এবং শ্বেতপত্র প্রকাশ,

৩) বিভিন্ন জেলা থেকে এ জেলায় শরণার্থীদের পুনর্বাসন বন্ধ করা,

৪) শরণার্থীদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নেয়া,

৫) নির্যাতিত ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও বিধ্বস্ত বৌদ্ধমন্দির পুনর্গঠন, এবং

৬) বাজারে বেচাকেনার উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা।

---

৫৩. সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, (ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৮৮)

৫৪. কাজী মন্টু, "ট্রাইবাল ইমার্জেন্সি ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস", *ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ভল্যুম ১৫, নং ৩৬

৫৫. স্বাধীনতা দেওয়ান, "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসন্তোষের ইতিকথা", *লাড়েই* (ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯০)

৫৬. তিন সংসদ সদস্য, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫শে এপ্রিল ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু জিয়া সরকার এসব দাবীর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বরং বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করেন। দীঘিনালা, রুমা ও আলীকদমে তিনটি সুবৃহৎ সেনানিবাস নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া সেনা হাউনী, আধা সামরিক ক্যাম্প এবং পুলিশ ক্যাম্প সকল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় স্থাপন করা হয়। আর সকল রাস্তা ও নদীপথে চেকপোষ্ট স্থাপন করা হয়। বিদ্রোহ দমন প্রশিক্ষণের জন্য মহালছড়ি আর ধূল্যাছড়িতে নৌঘাটি স্থাপন করা হয়। বিমান বাহিনীকে তৎপর করা হয়। সেনাবাহিনী আর পাহাড়ী জনগণের অনুপাত দাঁড়ায় ১ ঃ ৫।[৫৭]

কমলপতির ভয়াবহ রক্তের দাগ না শুকোতেই ১৯৮০ সালে সেনাবাহিনীর প্ররোচনায় বহিরাগত বাঙালীদের দ্বারা উপজাতীয়দের উপরে লোমহর্ষক আক্রমণ পরিচালিত হয়। যেমন- ১৫ই সেপ্টেম্বর রাইখ্যাবিলিতে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বেতবুনিয়া ইউনিয়নের বাউরা পাড়া, ১৯শে নভেম্বর উপলছড়ি গ্রামে, ২৯শে নভেম্বর লংগদু, ১১ই ডিসেম্বর নোয়াপাড়া ও বিধান কার্বারী গ্রামে এবং ২৩ শে ডিসেম্বর দাতবদুপ্যায় এর হত্যাকাণ্ড।[৫৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ট্রাইবেল কনভেনশনও কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০ সালে জিয়া সরকার সামরিক সমাধানের অংশ হিসেবে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী 'উপদ্রুত এলাকা বিল' (Disturbed Area Bill) সংসদে আনলে বিরোধী দলের প্রবল আপত্তির মুখে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই বিল উত্থাপনের পর পাহাড়ী জনগণ সরকারের উপর পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথকে মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বা সেনাবাহিনীর নন কমিশণ্ড অফিসার যে কোন ব্যক্তিকে বে-আইনী কার্যকলাপে লিপ্ত সন্দেহে গ্রেপ্তার কিংবা গুলি করার নির্দেশ দিতে পারবে, বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী, অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করার সন্দেহে যে কোন বাড়ী পোড়াতে বা জমি ক্রোক করতে পারবে। এই আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না।[৫৯]

'উপদ্রুত এলাকা বিল' সম্পর্কে লন্ডনের 'The Guardian' লিখেছে :

"..... that the army and police would be immune from challenge in the courts and could enter any premises without warrant. For the parliamentary opposition, the Act was seen as sanctioning violation of human rights. Such legislation is indeed

---

৫৭. দেশপ্রিয় চাকমা, 'Existence', (ঢাকা ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯২) পৃষ্ঠা ৮-৯

৫৮. ফেরদৌস হোসেন, *op. cit.*, p. 110.

৫৯. বিপ্লব চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা-০০১, এপ্রিল ১৯৯৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯

Dhaka University Institutional Repository



extraordinary since ever legislation is enacted in war time, such as the defence of India rules passed during the second world war or the defence of Pakistan rules promulgated during 1965 do not provide such powers of shooting to kill as are provided under the proposed disturbed Areas Act."[৬০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ ও অন্তর্জ্বালার উজ্জীবনে জিয়া সরকারের অবদান অসামান্য। যদিও ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এ অঞ্চল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শাসক গোষ্ঠীর উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হয়েছে।[৬১] কিন্তু পার্বত্যবাসীর মূল সমস্যাকে চিহ্নিত না করে এবং তা সমাধানের সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ না করে জিয়া সরকার শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহ দমনে যে কুটকৌশল গ্রহণ করেছেন তা একদিকে শ্রেণী শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন, আঞ্চলিক শোষণ ও বৈষম্যের নামান্তর। যে কোন শ্রেণী বিভক্ত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় জাতি দ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য বিশ্বে এমন কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নেই যেখানে জাতি দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত অথবা তুলনায় শক্তিশালী জাতি দুর্বলতর জাতি ও জাতিসত্তার উপর শোষণ নির্যাতন অব্যাহত রাখেনা।[৬২] তবে জাতিগত শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনাকে বিশ্বের অনেক দেশে ও সমাজে বাস্তবরূপ লাভ করতে দেখা গেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামও এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে উদ্ভূত এই সংগ্রাম ও সমস্যাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের চেষ্টা না করায় জিয়াউর রহমান সরকার জাতি গঠনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। ১৯০০ সালের *Hill Tracts Regulation Act.* এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের কোনো চেষ্টা না থাকলেও তাঁদের জীবন কিছুটা নিশ্চিন্ত রাখার এবং নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির রীতিনীতি অনুযায়ী নিজেদের জীবনধারণের একটি নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানী সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'পাহাড়িয়া অঞ্চল' হিসেবে সংরক্ষিত না রেখে সেখানে বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে *Hill Tracts Regulation 1900* এর গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধগুলি বাতিল করেন।

---

৬০. *The Weekly Guardian*, 28th April, 1981, London, UK

৬১. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলিকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, ১৯৭২) পৃষ্ঠা ৬৬-৭১

৬২. বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত, *পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১১-১৩

Dhaka University Institutional Repository



পাকিস্থান সরকারের এই পথ অনুসরণ করেই জিয়া সরকার উপজাতিদের সংগ্রাম দমন করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বহিরাগত বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ঘটান। বহিরাগত জনগোষ্ঠীকে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় জাতিগত সংঘাতের সূচনা হয়। ফলে তাঁর এতদিনকার কল্যাণমূলক কর্মসূচীর সমস্ত কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যায়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা পুনরুজ্জীবনের 'দ্বিতীয় জনক' [৬৩] হিসেবে চিহ্নিত হন। মূলতঃ পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঙালী এবং উপজাতীয় জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনতে জিয়া সরকার সক্ষম হন। যেখানে ১৯৭৪ সালে উপজাতি-বাঙালী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৭৭ ঃ ৩৩, সেখানে ১৯৮১ সালে সে অনুপাত দাঁড়ায় ৬০৩২ ঃ ৩৯ ৬৮ এ। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে এই জনসংখ্যার ভারসাম্য দেখানো হল।[৬৪]

| উপজাতি ও অ-উপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার | | |
|---|---|---|
| বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম | | |
| সাল | উপজাতি | অ-উপজাতি |
| ১৮৭২ | ৯৯.৯৯ | .০০১ |
| ১৮৮১ | - | - |
| ১৮৯১ | - | - |
| ১৯০১ | - | - |
| ১৯১২ | - | - |
| ১৯২১ | - | - |
| ১৯৩১ | - | - |
| ১৯৪১ | ৯৭.৫ | ২.৫<br>হিন্দু ১% মুসলিম ১.৫% |
| ১৯৫১ | ৯১ | ৯ |
| ১৯৬১ | ৮৮ | ১২ |
| ১৯৭৪ | ৭৭ | ৩৩ |
| ১৯৮১ | ৫৮.৬ | ৪১.৪ |
| ১৯৯১ | ৬০.৩২ | ৩৯.৬৮ |

৬৩. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, p.53.
৬৪. *Ibid.*, p.127.

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাঙালী এবং উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টায় সফল হলেও উপজাতি বিদ্রোহ দমন বা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

সরকারের পুনর্বাসন নীতি বাঙালীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছে তা নিম্নোক্ত প্রতিবেদনে বোঝা যায় ঃ

*"The commission interviewed a number of Bengali settlers in the Hill Tracts. These in the guchchagrams found life extremely difficult. They said that if they had the facilities and the support they would move back to the plains. They were not hill people but had been encourage to come to the CHT as a part of government policy."*[৬৫]

*The Chittagong Hill Tracts Commission. April 1994* এর প্রতিবেদনের ৩৭ নং পৃষ্ঠায় বসতি স্থাপনকারীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে -

*"Many Bengali settlers have become victims of the whole process. Particularly settlers in the Bengali cluster village. Many stated that they would happily return to the plains if there was place for them to go. A process of resettling settlers in the plain should be started. Several western donor government have expressed their willingness to consider allocating foreign aid for rehabilitation and employment schemes to relocates settlers outside the CHT. if the government of Bangladesh would request them to do so.*[৬৬]

জাতিগত বিদ্বেষ কখনও কারো জন্য নিশ্চিত শান্তি আনেনা, নিরাপত্তা সুরক্ষিত করেনা কিংবা গণতন্ত্রকে নিরাপদ করেনা। এসব ব্যবস্থায় সর্বদাই লাভবান হয় দেশ বিদেশের বিভিন্ন অপশক্তি। চক্রান্ত ও সন্ত্রাস বেড়ে ওঠে। সম্পদের অপচয়ে উৎপাদনশীল বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা বিপর্যস্ত হয়। জাতিগত সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্ন রাজনৈতিক। আর্থিক যোগান নির্ভর ত্রাণ সংস্থা বা পেশাগত মানবাধিকার কিংবা আইনের কাঠামোয় ফেলে

---

৬৫. Life is not ours- *op. cit.*, pp. 74-75.

৬৬. Life is not ours- The Chittagong Hill Tracts Commission, April, 1994, p.37.

Dhaka University Institutional Repository



এই সমস্যার সমাধান হয় না।[৬৭] ১৯৮১ সালের ২৯শে জুলাই *'The Guardian'* পত্রিকায় সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বক্তব্য তার প্রমাণ। তিনি বলেন- *"We are doing some wrong there. We are being unfair to the tribes. It is a political problem that is being dealth with by police and army action. Yet it can be settled politically very easily. We have no basis for taking over these lands and pushing the tribes into a corner. We should at least call a meeting of these tribal leaders and ask them their demands."*[৬৮]

১৯৮১ সালের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হওয়ার পিছনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিহিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।[৬৯] তবে এটা ঠিক জিয়াউর রহমানের মৃত্যু পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে প্রলম্বিত করেছে। যার দরুণ পরবর্তী সরকার জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানে কোনো সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

**৪.৬ সাত্তার সরকারের শাসনকাল (১৯৮১-১৯৮২)**

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর সাত্তার সরকারের প্রায় এক বছরের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়।[৭০] জিয়া সরকারের আমলে শিক্ষা, চাকুরী ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সাত্তার সরকারের আমলে তা লুপ্ত হয়ে যায়।[৭১] অগ্রগতির মধ্যে দেখা যায় ১৯৮২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি উপজাতীয় প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এই জেলার সমস্যা সমাধানের পন্থা নিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে মত বিনিময় করেন। তবে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একমাত্র আশার বাণী ছাড়া আর কার্যকর কিছুই হয়নি।

---

৬৭. বদরুদ্দীন উমর, *op. cit.*, p.66.
৬৮. *'The Weekly Guardian'*, Hong Kong, 29th July, 1981.
৬৯. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p.19.
৭০. স্বাধীনতা দেওয়ান, *op. cit.*
৭১. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p.20.

Dhaka University Institutional Repository



## ৪.৭ জেনারেল এরশাদের শাসনকাল (১৯৮২-১৯৯০)

১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ সামরিক আইন জারী করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ (এরশাদ নামে জনপ্রিয়) সাত্তার সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতারোহণের পর জেনারেল এরশাদ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে প্রথম দিকে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়ার মত অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বিপুল পরিমাণ অর্থবরাদ্দ করেন এবং পরে সে পরিকল্পনা আশানুরূপ সমাধান দিতে না পারায় একই সাথে একে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে যে দু'টি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হল- (১) শান্তিবাহিনীর সদস্যের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং তাদের পুনর্বাসনের আশ্বাস ও (২) জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ।

এরশাদ সরকারের এ দু'টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তিনি জনসংহতির মধ্যে ভাঙ্গন এবং প্রীতি গ্রুপের অস্ত্র সমর্পণ এর মত বিজয় অর্জন করেন। ১৯৮২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। আটদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কংগ্রেসে রাজনীতি ও রণকৌশলগত প্রশ্নে তীব্র বিতর্কের পর আদর্শগত প্রশ্নে পার্টি স্পষ্টত দু'ভাগে (মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদীতে) বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এম. এন. লারমা স্বয়ং এবং তাকে সমর্থন দিয়েছেন জে. বি. লারমা, কালীমাধব চাকমা, উষাতন তালুকদার, রূপায়ন দেওয়ান, সুধাসিন্ধু খীসা। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ভবতোষ দেওয়ান, প্রীতি কুমার চাকমা, ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান, দেবজ্যোতি চাকমা, সনৎ কুমার ও যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা। মার্কস্‌বাদীরা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলায় তারা 'লম্বা গ্রুপ' বা 'লারমা গ্রুপ' নামে পরিচিতি পান। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা সংক্ষিপ্ত সময়ে অধিকার আদায়ের কথা (প্রয়োজনে তারা ভারতের সাথে কনফেডারেশনেও রাজি) বলায় তারা বেঁটে বা 'প্রীতি গ্রুপ' নামে পরিচিত হন।

এ সময় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা গোপালকৃষ্ণ চাকমার সঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বিরোধ সৃষ্টি হয়। গোপালকৃষ্ণ চাকমা বিভিন্ন কারণে লারমাকে সহ্য করতে পারতো না। জানা যায়, লারমা সম্বন্ধে বিভিন্ন রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পৌঁছলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা শান্তিবাহিনীর মূল নেতা পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা করে এবং সে অনুসারে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি শান্তিবাহিনীর মূল নেতা পরিবর্তনের নির্দেশ দান করেন। ১৯৮২ সালে গোয়েন্দা সংস্থা থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরপরই প্রীতি কুমার গ্রুপের সদস্যরা লারমার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাবমূর্তি বিনষ্টের কাজে লোকজনকে নিয়োজিত করে। তারা ঐ সময় তার বিরুদ্ধে যেসব প্রচারণা চালায় তার মধ্যে রয়েছে- (ক) মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমা সর্বহারা চিন্তায় (মার্কস্‌বাদ) বিশ্বাসী। কিন্তু ভারত সরকার এ এলাকায়

Dhaka University Institutional Repository



মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না তাই শান্তিবাহিনীর নেতৃত্বে রদবদল করা প্রয়োজন। (খ) মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শুধুমাত্র তার ভাই সন্তু লারমা ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করে না। (গ) সন্তু লারমাকে কেন আবার ফিল্ড কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ করা হলো। (ঘ) লারমা দল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাধান বাংলাদেশ সংবিধানের মধ্যে খুঁজে পেতে চায় আর প্রীতি গ্রুপের লোকেরা ভারতীয় সাহায্যে এ এলাকা তাড়াতাড়ি স্বাধীন করবে। (ঙ) ১৯৭৪ সালে রাজা ত্রিদিব রায় যখন বার্মাতে পাকিস্থানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন সন্তু লারমা তার কাছ থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা পাকিস্তানী সাহায্য হিসেবে পায়। কিন্তু প্রীতি কুমারের লোকজন শান্তিবাহিনীর কর্মীকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সন্তু লারমা ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সে টাকা আত্মসাৎ করে নিজেদের পারিবারিক কাজে ব্যয় করেছে। (চ) লারমার ভুল নেতৃত্বের জন্য ভারত সরকার শান্তিবাহিনীকে পুরোপুরি সাহায্য করছে না। লারমা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আপনা আপনিই স্বাধীন হয়ে যাবে। তাই অন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্যের দরকার মনে করে না। (ছ) লারমার ভুল নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। যদি লারমা তাড়াতাড়ি বিপ্লব শেষ করতো তাহলে বাংলাদেশ সরকার বাঙালী পুনর্বাসনের সুযোগ পেত না এবং তারা সংখ্যালঘু হত না। (জ) পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কিন্তু লারমা ভ্রাতৃদ্বয় তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী পাহাড়ী অন্য নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনে শামিল করতে পারেনি। ওয়াকিবহাল সূত্রগুলোর মতে, প্রীতিকুমার গ্রুপ এ সময় নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং এলাকায় পরবর্তী সামরিক কার্যকলাপ, সংবিধান, দলীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসে নতুন একটি রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মানসে একটি নীল নকশা গোপনে তৈরী করে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দলিলটি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার হাতে পড়ে। উক্ত দলিলে আরও লেখা ছিল যে জনসংহতির নাম বাদ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে 'সুরতন' নাম দিয়ে দেশে এবং বিদেশে প্রচার চালিয়ে যাওয়া। উক্ত পরিকল্পনায় নাকি বিস্তারিতভাবে লেখা ছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় শান্তিবাহিনী নিম্নলিখিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম রাষ্ট্র সৃষ্টি করবে ঃ (১) এক ডিভিশন সৈন্য খাগড়াছড়ি পর্যন্ত যাবে এবং খাগড়াছড়ি দখল করবে। (২) অন্য এক ডিভিশন দীঘিনালা দখল করবে এবং লংগদু থানার তিনটিলা পর্যন্ত কভার করবে। (৩) একটি ডিভিশন মহলছড়ি থানার নীচে থাকবে এবং রাঙ্গামাটি দখল করবে। (৪) একটি ডিভিশন ঘাগড়া ও ওয়াগতে থাকবে এবং উক্ত ডিভিশনটি কাপ্তাই চন্দ্রঘোনা এবং বাইরের সাহায্য আসা বন্ধ করবে। (৫) একটি ডিভিশন রামগড় এবং ফেনী অঞ্চল কভার করবে। (৬) একটি ডিভিশন বান্দরবান ও আলীকদম দখল করবে। সূত্রগুলোর বর্ণনা মতে উক্ত নীল নকশায় আরো লেখা ছিল যে, ইসরাইল অস্ত্র রসদ এবং টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। এ নকশায় আরো লেখা ছিল যে, 'আই উইল ডু ইট উইথইন সিক্স মানথস্'। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository



জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতও নির্ধারণ করা হয়। বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় পতাকা হবে শান্তি প্রতীক 'হরিণ মার্কা' বিশিষ্ট গোলাকার সোনালী ধরণের একটি বৃত্ত। বাকি রং হবে সবুজ ধরণের এবং দৈর্ঘ্য হবে প্রস্থের দেড় গুণ। তারা চাকমা ভাষায় জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করেছিল।[৭২] এভাবেই জনসংহতি সমিতির মূল নেতৃত্বে বিপর্যয় বা ভাঙ্গন দেখা দেয়।

জনসংহতি সমিতির ভাঙ্গনের ফলে তাদের আর্মস ক্যাডার শান্তিবাহিনীও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৩, ৫ ও ৬ নম্বর সেক্টর লারমা গ্রুপকে এবং ১, ২ ও ৪ নম্বর সেক্টর প্রীতি গ্রুপকে সমর্থন করে। এর পরিণামে ১৯৮৩ সালের ১৪ই জুন মঙ্গলবার সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে বিশেষ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। শুরু হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে সুইসাইড স্কোয়াড হামলা ও গেরিলা যুদ্ধ।

১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর ক্যাপ্টেন এলিনের নেতৃত্বে প্রীতি গ্রুপের সুইসাইড স্কোয়াডের হামলায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের জনক, জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর আটজন সহযোগী সহ কল্যাণপুরে (বাঘমারা ক্যান্টনমেন্টে) নিহত হন। জানা গেছে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'RAW' এর কর্মকর্তারা প্রীতিগ্রুপের ওপর থেকে তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে[৭৩] দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে প্রীতি গ্রুপ এরশাদ সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার স্বাদ গ্রহণ করে। প্রীতি গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও মিলিটারী একাডেমীর পরিচালক নলিনী রঞ্জন চাকমা প্রায় আড়াই হাজার কর্মী, সমর্থক ও সহযোগীসহ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

লারমা গ্রুপে পলিটিক্যাল ক্যাডার বেশী থাকায় তারা রণনীতি ও কৌশলগত দিক গিয়ে এগিয়ে যায়। ১৯৮৫ সালের মে মাসে 'লারমা গ্রুপ' কে ঢেলে সাজানো হয় এবং পুনর্গঠিত করা হয়। 'লারমা গ্রুপ' সরকারের সাথে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান কল্পে মধ্যস্থতা করার জন্য সংলাপ কমিটি গঠন করে। উপেন্দ্রলাল চাকমা (খাগড়াছড়ি), শান্তিময় দেওয়ান (রাঙামাটি) এবং কে. এস. প্রু (বান্দরবান)-কে আহ্বায়ক করে দায়িত্ব প্রদান করেন।সংলাপ কমিটির মাধ্যমে এরশাদ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১শে অক্টোবর খাগড়াছড়ি জেলার পুজগাং এ। শুধু তাই নয় জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের মোট ৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকার ও পুনর্বাসিত বাঙালী জনসাধারণের বিরোধের মাত্রা এতটুকু কমেনি, বরং সংঘাত উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে।

---

৭২. সাপ্তাহিক *রোববার*, (ঢাকা, ২০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)

৭৩. প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫৫

*Dhaka University Institutional Repository*



১৯৮৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী বাঘাইছড়ি উপজেলায় কর্মরত শেল অয়েল কোম্পানীর ৬ জন বিদেশী কর্মকর্তাকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সিজকমুখ এলাকা থেকে অপহরণ করে এবং ২২ কেজি স্বর্ণ ও ১ কোটিরও বেশী বিদেশী ও বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়।[৭৪]

১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় শান্তিবাহিনী কর্তৃক ৭৫৬ জন বাঙালী ও ১১৬ জন উপজাতি নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৪৪৭ জন বাঙালী ও ৭১ জন উপজাতি।[৭৫] অপরদিকে বাঙালী বসতি স্থাপনকারীরা সরকারী বাহিনীর সহযোগীতায় ১৯৮৩ সালে বরকলে, ১৯৮৬ সালে বসাতচর, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, পানছড়ি ও দীঘিনালাতে, ১৯৮৮ সালে মারিশ্যাতে, এবং ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদুতে উপজাতীয়দের উপর আক্রমণ চালিয়ে বহু হতাহত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে জনসংহতি সমিতি প্রধান প্রতিপক্ষ। এর সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র তৎপরতার কারণে এরশাদ সরকার দমননীতির নামে পার্বত্য জনপদগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকে এবং পাশাপাশি সরকারীভাবে বাঙালীদের পুনর্বাসনের ফলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মেরুদন্ডকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সমস্যার সমাধান কল্পে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের অনুরোধে এরশাদ সরকার ১৯৮৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সফরের সময় পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকার করে তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এ. কে. খোন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন।[৭৬] জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ সালের ১৭ ও ১৮ই ডিসেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন পুজগাং কমিউনিটি সেন্টারে। আনুষ্ঠানিক দ্বিতীয় বৈঠকে জনসংহতি সমিতি সরকারের কাছে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৫ দফা দাবীনামা পেশ করে। দাবীগুলো নিম্নরূপ :

(১) নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক* মর্যাদা প্রদান, দেশরক্ষা, বৈদেশিক মুদ্রা ও

---

৭৪. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৭০

৭৫. সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, (ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮)

৭৬. বিপ্লব চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশনা-০০১, এপ্রিল, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২২

* সরকারের সাথে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠকে জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক মর্যাদার দাবী পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করে

Dhaka University Institutional Repository



ভারী শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, অর্থ, যোগাযোগ ও পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করা, কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'জুমল্যান্ড' নামে পরিচিত করা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা।

(২) গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণের সম্মতি না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও পরিবর্তন না করা ও দেশের অপরাপর অংশের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জরুরী আইন অথবা সামরিক আইন যাতে জারী করা না হয় সে রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং কেউ যাতে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন, ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি করতে ও বিনানুমতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক সংবিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

(৩) ১৯৪৭ সাল হতে এ পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় কিংবা সমতল ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তি ও বেদখল করে বসতি স্থাপন করেছে ও করতে থাকবে সে সব বহিরাগতকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরিয়ে নেয়া, পাকিস্থান শাসনামল হতে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব নরনারী ভারত ও বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে অথবা চলে যেতে বাধ্য হবে তাদের সকলকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা, কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা ৬০ ফুট নির্ধারিত করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোনো সদস্য ও জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত কারো নামে যদি কোনো প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কারো অনুপস্থিতিতে কোনো বিচার হয়ে থাকলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণ,

Dhaka University Institutional Repository



বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ, চাকুরীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আটককৃত সকল উপজাতীয়দের মুক্তি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সকল প্রকারের নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা, গুচ্ছ গ্রাম ও আদর্শ গ্রামসমূহ ভেঙে দেয়া, বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন বন্ধ করা, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া, দীঘিনালা , রুমা ও আলিকদম সেনানিবাস সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সরিয়ে নেয়া।[৭৭]

উক্ত ৫ দফা দাবীনামাকে সরকার পক্ষ সংবিধান পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে জনসংহতি নেতৃবৃন্দের কাছে পরদিনই ফেরত পাঠান। কারণ এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোন বিশেষ এলাকার জন্য প্রাদেশিক মর্যাদাসহ স্বায়ত্বশাসন প্রদান সাংবিধানিকভাবে অসম্ভব। আলোচনার অচলাবস্থার শুরু এখান থেকেই। অবশ্য এর পরেও আরও ৪টি বৈঠক হয়। কিন্তু সমস্যার কোন আশাব্যঞ্জক সাড়া মেলেনি। এ অবস্থায় সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা হিসেবে জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত নয় অথচ উপজাতীয় সমাজে প্রভাবশালী এমন কিছু সংখ্যক উপজাতীয় ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সরকারের কাছে ৯ দফা দাবী পেশ করে। এই ৯ দফা দাবীকে আইনগত ভিত্তি প্রদানের জন্য সরকার ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদে ৪টি বিল উত্থাপন করে। বিলগুলো হচ্ছে ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা সমূহ বিশেষ বিল ১৯৮৯। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত উক্ত বিল সমূহ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো : এর ফলে-

---

৭৭. জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-১ (জুম্ম জনগণের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামা)

*Dhaka University Institutional Repository*



১) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৩টি নির্ধারিত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

২) একজন উপজাতীয় নাগরিক এই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

৩) পরিষদের সংখ্যানুপাতিক হারে বিভিন্ন উপজাতীয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অ-উপজাতি নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৪) তিন বছরের জন্য এই সরকার পরিষদ নির্বাচিত হবে।

৫) ডেপুটি কমিশনার জেলা সরকার পরিষদের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৬) পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর সহ এর নিম্ন পর্যায়ের সকল পদের পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, খাজনা, ট্যাক্স আরোপ ও আদায় এবং স্থানীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করার ক্ষমতা প্রতিটি পার্বত্য জেলার থাকবে।[৭৮]

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হল পরিষদের পরিচালনাধীন সকল বিষয়ের উপর প্রতিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। পরিষদের ২২ নং অনুচ্ছেদে প্রধান প্রধান ২২টি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার পরিষদকে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলে নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। ৬৪ নং অনুচ্ছেদ বলে সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন জমি ব্যতীত পার্বত্য অঞ্চলের সকল প্রকার জমি বন্দোবস্ত এবং হস্তান্তরের চূড়ান্ত আদেশ পরিষদের কাছে অর্পণ করা আছে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা, কৃষি সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজসেবা, মৎস্য ও পশুপালন, ক্রীড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমবায়, আদিবাসী সামাজিক আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার, সংস্কৃতি এসব বিভাগগুলো পরিচালনার ভার পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র ঐক্যপরিষদ, পাহাড়ী গণ-পরিষদ, পাহাড়ী পেশাজীবি পরিষদ নামের কয়েকটি সংগঠন স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর বিরোধীতা করে একে 'গণবিরোধী ও ষড়যন্ত্রমূলক'[৭৯] বলে আখ্যায়িত করে। জনসংহতি সমিতির মতে যে সব কারণে জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গ্রহণযোগ্য নয়, তা হলো-

---

৭৮. *দৈনিক বাংলা*, (ঢাকা, ১লা মার্চ, ১৯৮৯)

৭৯. জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-২, (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে আনীত পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল- এর উপর জনসংহতি সমিতির বিবৃতি)

*Dhaka University Institutional Repository*



১) এই জেলা পরিষদে ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লঙ্ঘন করে চার দফা লক্ষাধিক বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আইনানুগ অধিকার দেয়া হয়েছে এবং বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২) জুম্ম জনগণের ভূমিস্বত্ত্ব সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়নি এবং সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই হ্রদ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্ত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই বরাত দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের ৯০ ভাগ জমি হরণ করা হয়েছে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসনে প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

৪) বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হয়নি।

৫) অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৬) জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও সংগঠন, ঐতিহ্য ইত্যাদি সাংবিধানিক উপায়ে সংরক্ষিত হয়নি।

৭) দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিন ভাগে ভাগ করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

৮) জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারেনি।

৯) সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নেই।[৮০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম এর স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতি বিরোধীতা এবং জনসংহতি সমিতি পূর্বে প্রদত্ত ৫ দফা দাবী নামা মেনে নেয়ার দাবী উত্থাপন সত্ত্বেও সরকার তাতে কর্ণপাত না করে ১৯৮৯ সালের ২৫ শে জুন সামরিক ও বেসামরিক ছত্রছায়ায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। যদিও এই নির্বাচনে উপজাতীয় জনগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেনি, তবু জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর পক্ষে এই নির্বাচন বানচাল করাও সম্ভব হয়নি। আসলে পার্বত্য জেলা পরিষদের এই নির্বাচন বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় নতুন সংকট এনে দেয় যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

---

৮০. ফেরদৌস হোসেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা", ড. আবুল কালাম সম্পাদিত, *প্রবন্ধাবলী-৩*, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository



**দু'ধারায় বিভক্ত উপজাতীয় নেতৃত্ব :**

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাইরে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যে সব উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন এরশাদ সরকার তাদেরকে রাজনৈতিক টোপে ফেলে ক্ষমতা অর্পণ করেন। ফলে একদিকে নিরাপত্তাবাহিনী ও বাঙালী পুনর্বাসিতদের বিরুদ্ধে এবং অপরদিকে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা সুবিধাভোগী এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতিকে রণকৌশল ও রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছে। এভাবেই এরশাদ সরকারের সময় উপজাতীয় নেতৃত্ব দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদ গুলির নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হওয়ায় নেতৃত্ব চর্চার ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। পরিষদ গঠন এবং তার মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে একটি সুবিধাভোগী উপজাতীয় গোষ্ঠী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শান্তিবাহিনীর জন্যে এ ব্যাপারগুলো একটি রাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিলে তারা মরিয়া হয়ে বিজয় অর্জনের জন্য সশস্ত্র তৎপরতা চালু রাখে। এরশাদ সরকারের জাতিগঠন কার্যক্রমে এই ধরণের রাজনৈতিক কৌশল সাময়িক সুফল দিলেও ভবিষ্যতের শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে পারেনি। জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন উপজাতীয় সংগঠন যেমন: পাহাড়ী জনকল্যাণ সমিতি, ট্রাইবাল কনভেনশন, জনকল্যাণ পরিষদ, হেডম্যান এসোসিয়েশন, মারমা উন্নয়ন সংসদ, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ ইত্যাদি উপজাতীয় সংগঠন এবং জেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করায় রাজনৈতিক বিভক্তি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও জনসংহতি সমিতির প্রতিই ব্যাপক সংখ্যক উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে। কারণ দীর্ঘ দেড় দশক যাবত সশস্ত্র আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এক অন্যতম স্থান দখল করে নিয়েছে।[৮১]

**৪.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল**

১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকার এর পতন এবং তৎকালীন প্রধান তিন বিরোধী জোটের আহ্বানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাহাব উদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি বাতিলের দাবীতে ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করে এবং ভারত থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তিন জেলার জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী

---

৮১. জুম বিজয় চাকমা, "পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন : অতঃপর", *দি নেইন ট্রিম*, (ঢাকা, অনিয়মিত সংকলন, ১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository



জানালেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯৯০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রাঙামাটি সফরে এসে স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি বাতিল হবেনা বলে ঘোষণা দেন। এভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বল্পকালীন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের ব্যাপারে কোন রূপ নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া ও তা কার্যকর করা হয়নি।

**৪.৯ বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকাল (১৯৯১ - ১৯৯৬)**

পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগঠন সমস্যা সমাধানে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে তেমন উল্লেখ যোগ্য কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বিতর্কিত স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের পরিবর্তে তাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের ১৩ই মে বেগম খালেদা জিয়া খাগড়াছড়ি জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি দেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব"।[৮২] আর এ লক্ষ্যেই সরকার তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ কে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সর্বজনাব শাহজাহান চৌধুরী এমপি, সৈয়দ অহিদুল আলম এমপি, মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এমপি, রাশেদ খান মেনন এমপি, আব্দুল মতিন খসরু এমপি।[৮৩] কিন্তু এ কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদদের না রাখায় প্রচণ্ড জনরোষের কারণে পরে কর্তৃপক্ষ সাংসদ কল্পরঞ্জন চাকমাকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন।

কিন্তু এ কমিটিও সরকারের পক্ষে তেমন কোন আশাপ্রদ সুফল বয়ে আনতে পারেনি। ১৯৯২ সালের ৮ই জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সম্বলিত তিনটি বিল উপস্থাপন করা হলে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত তিন সাংসদ দীপংকর তালুকদার, কল্পরঞ্জন চাকমা ও বীর বাহাদুর বিলগুলি উত্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান, কিন্তু ধ্বনি ভোটে তাদের আপত্তি নাকচ হয়ে যায়।[৮৪]

বিএনপি সরকারের সময়ে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হলে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সরকারের মানসিকতা সম্মন্ধে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবারও সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। ফলে জাতিগঠন প্রক্রিয়া প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন লোগাং গ্রামে বাঙালী ও উপজাতীয় বালকদের মধ্যে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে

---

৮২. দৈনিক *সংবাদ*, (ঢাকা, ১৪ই মে, ১৯৯২)
৮৩. দৈনিক *সংবাদ*, (ঢাকা, ১০ই জুলাই, ১৯৯২)
৮৪. *The Bangladesh Observer*, (Dhaka, 9th July, 1992)

Dhaka University Institutional Repository



পুনর্বাসিত বাঙালীরা, ভিডিপি, আনসার বাহিনী ও বিডিআর সদস্যদের ছত্রছায়ায় এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। এতে প্রায় ৩০০ জন পাহাড়ী নিহত এবং তাদের ৫৮৭ টি ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[৮৫] এই ঘটনার পরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৫শে এপ্রিল, বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল এবং ১৩ই মে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া লোগাং পরিদর্শন এবং গতানুগতিক রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেন। লোগাং এ সংঘটিত হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য সরকার ১০ই মে প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সুলতান হোসেন খান কে নিয়ে ১ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৯২ সালের ৭ ই অক্টোবর রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করা হয়। রিপোর্টের বিরুদ্ধে সাংসদ দীপংকর তালুকদার এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ প্রতিবাদ জানিয়ে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তথ্য নির্ভর ও নিরপেক্ষ নয় বলে দাবী করেছেন।[৮৬]

১৯৯২ সালের ১২ ই জুন 'সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল' নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা লোগাং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সামনে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ-সমাবেশের আয়োজন করে। তারা বাংলাদেশের হাইকমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে এবং লোগাং হত্যাকাণ্ডে নিহতদের সংখ্যা ১২০০ বলে দাবি করে।[৮৭]

অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে শান্তিবাহিনীর একদিকে সশস্ত্র তৎপরতা অন্যদিকে সরকারের গঠনমূলক সদিচ্ছার অভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা হয়। ১৯৯২ সালের ১২ই মে সরকারের বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগ জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য গঠিত 'যোগাযোগ কমিটি'- কে স্মারক নং এস এবি-(সম)-৪৮/৯১/৪৭৯ মূলে অনুমোদন করে।[৮৮] সরকার যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠকের পরিবেশ সৃষ্টি করলে ১৯৯২ সালের ৫ই নভেম্বর খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপরে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৬শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে। দু'টো বৈঠকেই জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্বদেন সমিতির প্রধান জোতিরিন্দ্র নারায়ণ বোধিপ্রিয় লারমা সংক্ষেপে সন্তু লারমা এবং সরকার পক্ষে নেতৃত্বদেন যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ।

---

৮৫. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p.26

৮৬. *The Bangladesh Times*, (Dhaka, 8th October, 1992)

৮৭. সাপ্তাহিক *একতা*, (ঢাকা, ৯ই জুলাই, ১৯৯২)

৮৮. প্রদীপ্ত ঘীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭৭

Dhaka University Institutional Repository



এই বৈঠকে জনসংহতি সমিতি তাদের অস্ত্র বিরতি ৩১শে মার্চ ১৯৯৩ পর্যন্ত বাড়ায়।[৮৯]

বিরাজিত অশান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ, ব্যাপক গণ-সচেতনতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে সামনে রেখে ১৯৯২ সালের ১৭ই জুন ৫ দল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে ৫ দলের পক্ষথেকে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরা হয় এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে একটি জাতীয় সমস্যা, জাতিকে আস্থায় নিয়েই রাজনৈতিক ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে'। এমন মত ব্যক্ত করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করা হয় :

ক) অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠান ও উক্ত সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধি, আইনজীবি, লেখক, সাংবাদিক ও পাহাড়ী জনগণের প্রতিনিধি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন;

খ) সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং এতদসংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি গঠন;

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার অধিকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংবিধানের অধীনে তাদের স্বশাসনের বিষয় সুনির্দিষ্টকরণ;

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের কাছথেকে নেয়া জমি ফেরতদান, সংরক্ষিত গ্রাম ভেঙ্গে দিয়ে তাদের নিজ পছন্দমত এলাকায় গমনের সুযোগ দান, তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ যাতায়াতের অধিকার প্রদান;

ঙ) জমির উপর পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ;

চ) বাঙালীদের বলপূর্বক পুনর্ববাসন যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত ফর্মূলা উদ্ভাবন;

ছ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫ দল মনে করে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মনে আস্থা ও সকল শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আশু ব্যবস্থা হিসেবে-

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণ, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকার প্রদান;

---

৮৯. *The Daily Star*, (Dhaka, 27th December, 1992)

*Dhaka University Institutional Repository*



খ) শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা, হত্যা, লুট বন্ধ করা;

গ) মানবাধিকার লংঘনের সকল ঘটনার তদন্তানুষ্ঠান ও অপরাধীদের শাস্তি দান;

ঘ) ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী চাকমাদের দেশে ফেরত আনা ও সীমান্তের ওপার থেকে সকল বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করা;

ঙ) সর্বোপরি দেশবাসীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখতে সঠিক সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।[৯০]

১৯৯২ সালের ১১ই জুলাই ঢাকার পুরানা পল্টনে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় "পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করে ব্যারিষ্টার লুৎফর রহমান শাহজাহানকে আহবায়ক এবং আনু মুহাম্মদ, মোস্তাফা ফারুক ও প্রশান্ত ত্রিপুরাকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৭৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য অন্য সদস্যদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন এমপি, এ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি, বীর বাহাদুর এমপি, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, দিলীপ বড়ুয়া, নুরুল ইসলাম নাহিদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ড. আনিসুজ্জামান, শামসুল হক চৌধুরী, ড. হাসানুজ্জামান, ফয়েজ আহমেদ, বদরুদ্দিন উমর, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, পান্না কায়সার, ড. শামসুল ইসলাম খান, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, এ্যাডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, প্রসীত বিকাশ খীসা উল্লেখযোগ্য। এই কমিটির সভায় কাজের ভিত্তি হিসেবে একটি খসড়া প্রস্তাব বিবেচনা করে ৬ টি দাবী সরকার সমীপে পেশ করার জন্য গ্রহণ করা হয়। দাবীগুলো নিম্নরূপ:

১) পার্বত্য অঞ্চলে এ যাবৎকালে সংঘটিত ঘটনাসমূহ ও সমস্যার উৎস অনুসন্ধানে এবং সমাধানের পথ ও পদ্ধতি নির্দেশের জন্য উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন। কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, আইনজীবি, লেখক, সাংবাদিক ও পাহাড়ী জনগণের প্রতিনিধি রাখতে হবে। এ যাবৎকালের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং সার্বিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ;

---

৯০. *অ্যানগার্ড*, (জুলাই, ১৯৯২ সংখ্যা)

Dhaka University Institutional Repository



২) এ অঞ্চলের প্রশাসনকে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে, আইন শৃংখলা, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাজের দায়িত্ব বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ। বর্তমান জেলা পরিষদ বাতিল করে এ অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, একই সাথে সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, বিদ্বেষ নিরসনের রাজনৈতিক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩) পাহাড়ী জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমি তাদের ফেরতদান, গুচ্ছ গ্রাম ভেঙ্গে দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় যাবার ব্যবস্থা করা। এলাকায় শিল্প সহ অকৃষি খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;

৪) বাঙালীদের আরোপিত ও বলপূর্বক পুনর্বাসন যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারায় তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে এবং যে সরকারী ভর্তুকি দিতে হচ্ছে তার অবসানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেখানে থাকতে অনিচ্ছুক বাঙালীদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ইচ্ছুক পাহাড়ীদের দখলিকৃত ভূমি থেকে সরিয়ে অকৃষি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এ অঞ্চলে পাহাড়ী জনগণের ভূমিস্বত্ত্ব কর্মসংস্থানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান;

৫) এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের ভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে টিকে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দান করে সংবিধানে তার উল্লেখ এবং নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে যাতে তারা গণতান্ত্রিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬) পাহাড়ী জনগণের প্রতি বিদ্বেষ, অসম্মান ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং বাঙালী জনগণের সাথে তাদের সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক, বেতার, টিভি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; [৯১]

দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণ যে চেতনা অর্জন করেছে তা এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সব সময়ই সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহের একটি প্রধান অংশ বাঙালীদের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়েছে। এজন্যই অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জাতিগত সমস্যার সমাধান অনেক সহজ।

---

৯১. *হিল পিপলস*, (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা)

Dhaka University Institutional Repository



কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কেউই উপজাতীয় জনগণের আসল জাতিগত সমস্যা অনুধাবন ও তা সমাধানে কার্যকর ও ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে পারেননি। নিজেদের মতাদর্শের বাহিরে গভীর আন্তরিকতা বা স্বার্থত্যাগ কেউই দেখাতে পারেননি। বেগম খালেদা জিয়ার বি.এন.পি সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। একদিকে ৭টি বৈঠক করে আলোচনার নামে প্রহসন চালিয়েছে, অন্যদিকে বাঙালীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়ে উপজাতীয় জনগণের তুলনায় বাঙালীদের সংখ্যাধিক্য করার লক্ষ্যে কাজ করেছে। ফলে সমস্যা আলোর মুখ দেখতে পায়নি। যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

### ৪.১০ শেখ হাসিনার শাসনকাল (১৯৯৬- )

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতালাভ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ক্ষমতারোহণ পার্বত্যবাসীদের আশান্বিত করে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকায় আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে দেশবাসী কার্যকর ভূমিকা আশা করে। প্রথম দিকে অবশ্য কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন তারিখে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার লাল্যাঘোনার হিল উইমেন ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ পাহাড়ী জনগণকে বিস্মিত করে।[৯২] পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগ সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় শান্তিবাহিনী সার্বিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২৮ জন বাঙ্গালী কাঠুরিয়াকে হত্যা করে।[৯৩] পরবর্তীতে ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে একতরফা অস্ত্র বিরতির ঘোষণা দিলে আওয়ামী লীগ সরকার উক্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং মন্ত্রী পরিষদ সভার আলোচ্য সূচীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কোন বিষয় না থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ'র নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ :[৯৪]

১। আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্ চীফ হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, কনভেনার।

২। এ. বি. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সদস্য।

৩। কল্পরঞ্জন চাকমা এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৪। প্রকৌশলী মোশাররফ হোসেন এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

---

৯২. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, p.28

৯৩. *Ibid.*

৯৪. দৈনিক *সংবাদ*, (ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

*Dhaka University Institutional Repository*



৫। আতাউর রহমান খান কায়সার শিল্পপতি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৬। দীপঙ্কর তালুকদার এমপি, আওয়ামী লীগ সদস্য।

৭। আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি, বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)।

৮। সৈয়দ অহিদুল আলম এমপি বিএনপি সদস্য (অনুপস্থিত)।

৯। এডভোকেট ফজলে রাব্বি এমপি, জাপা সদস্য।

১০। এ. কে খন্দকার সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান, প্রাক্তন কনভেনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

১১। আলী হায়দার খান, প্রাক্তন বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

১২। এস, এস, চাকমা, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব।

**যোগাযোগ কমিটি**

১। হংসধ্বজ চাকমা, কনভেনর

২। নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, সদস্য

৩। কৈ শৈ অং মারমা, সদস্য

৪। মথুরা লাল চাকমা, সদস্য

৫। মোঃ সাফি, সদস্য

৬। বিশ্বজিৎ চাকমা, সদস্য

**পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে**

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)

২। গৌতম কুমার চাকমা

৩। রুপায়ন দেওয়ান

৪। সুধা সিন্ধু খিসা

৫। রক্তউৎপল ত্রিপুরা।

এর পর পার্বত্যাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় বৈঠকের পর বৈঠক।

**সরকার ও জনসংহতি সমিতিরি সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর ও ভঙ্গুর জাতিগঠন ব্যবস্থায় আশার আলো**

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতালাভ, ভারতে উদারপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং উভয় সরকারের ঘনিষ্ট সহযোগীতার ফলে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারতে দেব গৌড়ার সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository



সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে উৎসাহী ছিলেন। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি সে আশা আকাঙ্খারই সফল বাস্তবায়ন। পাশাপাশি ভারতের উত্তর-পূর্বের বিদ্রোহ কবলিত 'সাত বোন রাজ্য' গুলোতে শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বিষয়টিতেও দেব গৌড়ার সরকার গুরুত্ব দেয়। উত্তর পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তেমনি শান্তিবাহিনীর সমস্যা সমাধানেও ভারতের ভূমিকা লুকানো নেই।[৯৫] শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েই ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে কাউকে ব্যবহার করতে দিবেন না। সে অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থাও নেয়। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বিদ্রোহীরা সরে পড়ে এবং এদেশের মধ্য দিয়ে তাদের অস্ত্র বা রসদ সরবরাহের লাইনগুলোও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ভারত সরকার মনে করে পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আই. এস. আই. বাংলাদেশকে ব্যবহার করে ভারতের বিদ্রোহীদের সহায়তা দিয়ে এসেছে। ভারতীয় বিদ্রোহীদের ব্যাপারে বাংলাদেশের মনোভাব প্রকাশিত হবার পর শান্তিবাহিনীর ক্ষেত্রে ভারতীয় শুভেচ্ছা দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। শান্তিবাহিনীকে আর সহায়তা দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে। দেব গৌড়ার পর ইন্দর কুমার গুজরালের সরকারও এ ব্যাপারে আরও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেন। ভারতের ত্রিপুরা থেকে শান্তিবাহিনীকে ঘাঁটি উঠাতে হয়েছে। জনসংহতি নেতারা ভারতীয় পক্ষ থেকে চাপের মধ্যে পড়েছেন। তাদের ট্রেনিং দেয়া, খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৯৬] এসব কারণে শান্তিবাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দ্রুত সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, নানা কারণেই শান্তিবাহিনীর মধ্যেও এক ধরণের যুদ্ধ ক্লান্তি ভর করছে। গত ২৫ বছরে তাদের সামরিক সংঘাতের ইতিহাসে এমন কোন বড় সাফল্য নেই যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর সামরিক সংঘাত এবং বাঙালী উপজাতি দাঙ্গায় গত আড়াই দশকে ২০ হাজার [৯৭] মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। কিন্তু শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো এলাকাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। অন্যদিকে সংঘাত ও যুদ্ধাবস্থার কারণে পাহাড়ে সাধারণ মানুষ এ সময়কালে কখনোই শান্তি পায়নি। তাছাড়া গত সাড়ে চার বছর ধরে যুদ্ধ বিরতি চলার পর শান্তিবাহিনীর পক্ষেও আবার যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার মন মানসিকতা নেই। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের নতুন রিক্রুটমেন্টও এক রকম বন্ধ। সাধারণ পাহাড়ী জনগণও শান্তি চান, চান স্বস্তি নিয়ে বাঁচতে। এ পরিস্থিতি উপেক্ষা করা শান্তিবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

---

৯৫. *চলতিপত্র*, (ঢাকা, ১৭ই মে, ১৯৯৭ সংখ্যা), পৃষ্ঠা-১০
৯৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, (ঢাকা, ১৬ই মে, ১৯৯৭)
৯৭. *চলতিপত্র*, *Op. cit.*

Dhaka University Institutional Repository



তাই গত ২রা ডিসেম্বর তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ নিরসনে এই চুক্তি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।

এর পরে চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী '৯৮ খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা আর আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) তার নিজের অস্ত্রটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে। প্রথম ব্যাচে শান্তিবাহিনীর মোট ৭৩৯ জন সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় ব্যাচে শান্তিবাহিনীর ৫৪৩ জন সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এর উপস্থিতিতে এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী তৃতীয় ব্যাচে শান্তিবাহিনীর ৪৩৩ জন সদস্য চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্‌র কাছে তাদের অস্ত্র জমা দেয়। বাকীরা চতুর্থ ব্যাচে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনর এর কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে। দেশী বিদেশী অতিথিবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গ, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ জাতি গঠনে এই শান্তির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং এভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

# জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনীতি

## ৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও গুরুত্ব

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশে, দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাংশে আর বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রায় ২১.১০° থেকে ২৩.৪৭° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১.৪০° থেকে ৯২.৪২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বা Chittagong Hill Tracts এর অবস্থান। বাংলাদেশের প্রশাসনিক তিনটি জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এর মোট ১৩,১৪৮ বর্গকিলোমিটার বা ৫০৮৯ বর্গমাইল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আয়তনে অঞ্চলটি লেবানন, সাইপ্রাস, ব্রুনাই, কাতার কিংবা লুক্সেমবার্গের চেয়ে বড়। বাংলাদেশের এই বৃহৎ পার্বত্য অঞ্চলটি সব দিক দিয়ে ভূমি পরিবেষ্টিত। অঞ্চলটির সবচেয়ে নিকটতম সমুদ্র উপকূল দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইখংছড়ি থেকে মাত্র ১২ কি. মি. পশ্চিমে কক্সবাজার জিলার উখিয়ার কাছে অবস্থিত। পার্বত্য রাঙামাটির পশ্চিম প্রান্তের কাউখালি থেকে মাত্র ৩০ কি. মি. দূরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামের অবস্থান এবং কাপ্তাই থেকে ৫০ কি. মি. দূরে বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত জলরাশীর গভীর সমুদ্রের শুরু। এক কথায় বলা যায় যে, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জিলার সংকীর্ণ একফালি ভূভাগ যা কোনো স্থানেই পূর্ব পশ্চিমে ৫০ কি. মি. এর চেয়ে বেশী প্রশস্ত নয়- তা পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে রেখেছে।[২] চট্টগ্রামের বন্দর যা কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা এবং সমস্ত চট্টগ্রামের বন্দর কলকারখানা এবং নগরী সহ সমস্ত জিলা, পাশ্ববর্তী কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর এবং চাঁদপুর জিলা সমূহের বিদ্যুতের সম্পূর্ণ সরবরাহ এই কর্ণফুলীর জলের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নৌ-পরিবহন এবং কৃষির জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলাদ্বয় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রবাহিত কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা ইত্যাদি নদীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় যে সমস্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জিলাদ্বয়ের প্রায় সোয়াকোটি মানুষের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্ব এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের অস্তিত্ব ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম উৎস পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। এসব দিক বিবেচনায়

---

১. Statistical Pocketbook of Bangladesh, B.B.S. 1991.

২. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository



বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের সবচেয়ে অরক্ষিত অথচ আঞ্চলিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক এলাকা। সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার (Uni-Potar Global System) অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে এশিয়া মহাদেশে ভারত এবং চীন ভবিষ্যৎ নব্য-পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে।[৩]

এমন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগরের প্রবেশ পথে বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে মাত্র কয়েক কি. মি. দূরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভৌগলিক অবস্থানে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও বার্মার পশ্চিম সীমান্তের সাথে ভৌগলিক ভাবে যুক্ত। অঞ্চলটির পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য (সাবেক লুসাই হিল্‌স্ অঞ্চল) দক্ষিণে মায়ানমারের (পূর্বের নাম বার্মা) আরাকান রাজ্য, উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জিলা অবস্থিত।[৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ সমূহ যেমন, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এবং মায়ানমারের আরাকান, শান, কোচিন এবং চীন প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার প্রবনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।[৫] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ এবং সংলগ্ন মায়ানমারের উত্তরাংশের উল্লেখিত রাজ্য সমূহের উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী সমূহের পুরো জনসংখ্যাই মঙ্গোলীয় তিব্বতি এবং বর্মী জাতিতাত্ত্বিক ধারার অন্তর্ভূক্ত। এলাকাটির জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগই বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং জনগোষ্ঠীর সাধারণ সাংস্কৃতিক সামাজিক ধারার কিছু কিছু বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে।

ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপবর্তী পশ্চাদভূমি হিসেবে এবং চীন, ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আশিয়ান (ASEAN) ভুক্ত অর্থনৈতিক শক্তির প্রায় সমদূরবর্তী প্রভাব ভূমি এশিয়ার এই ত্রিভূজ ভূ-ভাগটি বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ভূ-ভাগের বিশেষ তাৎপর্যময় স্থানে অবস্থিত। ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্ব বহন

---

৩. *Ibid.*

৪. Amin M. N. "Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tracts", *Regional Studies*, 1988/89, Vol. VII, No. 1, Islamabad.

৫. Sukhwal, B.L., *India : A Political Geography*, Allied Publishers, Bombay, 1971, pp. 219-223

Dhaka University Institutional Repository



করলেও কৌশলগত দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অত্যন্ত অসুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য বহন করে। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলটির সন্নিহিত অবস্থান অত্যন্ত প্রতিকূল। একমাত্র পশ্চিমের বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া এলাকাটির উত্তর পূর্ব কিংবা দক্ষিণ পূর্বাংশের ভারত এবং মায়ানমারের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহ অত্যন্ত দূর্গম পার্বত্য বনাবৃত এবং জনবিরল অনুন্নত ভূ-ভাগের সমষ্টিমাত্র।[৬] পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি উত্তরপূর্ব দিকে ভারতের মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম ছাড়িয়ে প্রায় ৬৫০ কি. মি. দূরে চীনের ইউনান প্রদেশের সীমান্ত অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (উঃ পঃ) জিলার প্রায় ১১০ কি. মি. সীমান্ত ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সংলগ্ন। পার্বত্য রাঙামাটির ২৪০ কি. মি. সীমানা ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভক্তি নির্দেশ করে এবং পার্বত্য বান্দরবান জিলার প্রায় ১৫৫ কি. মি. সীমান্তরেখা মায়ানমারকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করেছে।[৭] পার্বত্য চট্টগ্রামের আকৃতি অসংবদ্ধ *(Non-compact)* এবং দীর্ঘায়তন *(Elongated)*। প্রস্থের তুলনায় অঞ্চলটি কয়েকগুণ বেশী দীর্ঘ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৃহত্তম ভূ-ভাগ থেকে একটি দুর্বলভাবে সংযুক্ত অভিক্ষেপিত ভূ-ভাগ। এসব ভূ-পারিসরিক বৈশিষ্ট্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক বলে বিবেচ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট বিদেশী শক্তির প্রভাব ও সংযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] অঞ্চলটির মিশ্র জনসংখ্যা এবং বিপুল ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নানা আঞ্চলিক এবং দূরবর্তী আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহকে অঞ্চলটির উপর নজর রাখতে উৎসাহিত করেছে। ভারত মহাসাগরে এবং সংলগ্ন ভৌগলিক এলাকায় নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরী করতে বা ধরে রাখতে ভারত, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসিগোষ্ঠী বাংলাদেশের এই নাজুক অঞ্চলটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতে উৎসাহিত হচ্ছে। এমনকি অতি সম্প্রতি দূরপ্রাচ্যের জাপান এবং দূরান্তের অষ্ট্রেলিয়ার মত আপাতঃ নিরীহ রাষ্ট্রের আগ্রহও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানের বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি *(Economic Super Power)* জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে সাম্প্রতিক বিশ্বের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের ধারায় বিশ্ব মঙ্গোলীয় বা বিশ্ব বৌদ্ধ পুনরুত্থান *(Pan-Mongolian or Pan Buddhist Revivalism)* এর আওতায় এবং প্রকৃত অর্থে

---

৬. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি*, Op. cit.

৭. Bangladesh Administrative Map, Prepared by Graphosman, Dhaka, 1992

৮. Dr. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The Untold Story*, Centre for Development Research, Bangladesh (CDRB) 1992, p. 26.

Dhaka University Institutional Repository



অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অঞ্চল সমূহে স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে জাপানের ঐ সচেতনতা।[৯] অষ্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত রাখতে বা খর্ব করতে এবং শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে প্রখর নজর রাখছে এবং 'মানবাধিকার প্রশ্ন' তুলে বাংলাদেশের উপর চাপ ফেলতে প্রয়াস পাচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার (সাবেক বার্মা), ভারত ও চীনের কেমন ধরণের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে নিম্নে আমারা সে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করবো।

### ৫.২ কতিপয় প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ

মায়ানমার (বার্মা) এর রাজনৈতিক স্বার্থ ও কৌশলগত ভূমিকা :

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মায়ানমারের প্রায় ১৭০ কি. মি. সাধারণ সীমানা বর্তমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের ধর্ম, ভাষা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সাথে মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারের ঐ অঞ্চল সমূহের বিভিন্ন জাতিসত্তা বিশেষ করে কারেন, রোহিঙ্গা, শান, চীন ইত্যাদি উপজাতিরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে লিপ্ত। তাছাড়া ঐ এলাকায় কম্যুনিষ্ট গেরিলাদের তৎপরতাও প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।[১০] পার্বত্য চট্টগ্রামের 'মারমা' সম্প্রদায় অধ্যুষিত বান্দরবানকে সম্প্রতি বোমাং রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংবাদ বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় আরেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ১৭.০৫.৯৭ ইং তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার এক সংবাদ অনুযায়ী[১১] মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহীদের ১০টিরও বেশী দল ছুট গ্রুপ বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়ে 'বোমাং রাজ্য' প্রতিষ্ঠার মদদ দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির সমঝোতার প্রেক্ষিতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা সম্প্রদায়ের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি নয় বলেই বান্দরবানকে ঘিরে মায়ানমারের প্ররোচনায় তাদের এই নতুন স্বপ্নের সৃষ্টি। আরাকানের রোহিঙ্গাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের বর্তমান সম্পর্ক খুবই খারাপ। এমতাবস্থায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই মায়ানমারকে সম্পূর্ণ এলাকাটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হচ্ছে।

---

৯. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি*, *Op. cit.*

১০. *Ibid.*

১১. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, (ঢাকা, ১৭ই মে, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ ও ভূমিকা :

বাংলাদেশের জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে ভারত।[১২] শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সংগঠিত করা থেকে তাদের আশ্রয়দান, অস্ত্রযোগানো, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ দান এবং আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে এদেরকে সমর্থন দান করার ব্যাপারে ভারতের প্রত্যক্ষ সংযোগের অজস্র প্রমাণ রয়েছে।[১৩] ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতীয়দের পক্ষ থেকে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ওপর পরিচালিত নির্যাতনের তথ্যমূলক বিবরণ দিয়ে এই সমস্যার আশু সমাধানে তাঁর সহযোগীতা কামনা করা হয়।

১৯৮০ সালের ৯ই আগষ্ট স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় ৩শ লোক আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের ভিসা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ভিসা অফিসার সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান দাবি করা হয়।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে বাংলাদেশের শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বৌদ্ধদের ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন।

১৯৮৮ সালের ১৭ ই এপ্রিল ভারতীয় টেলিভিশন 'দূরদর্শন' পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় শরণার্থী সমস্যার উপর একটি প্রতিবেদন প্রচার করে। বাংলাদেশ সরকার এ জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সংখ্যালঘু বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা *"International Work Group for Indigenous Affairs"* এর একটি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট দেয়। লন্ডনে রামেন্দু শেখর দেওয়ান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘের কাছে আবেদন করেছেন যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়।[১৪]

---

১২. Hossain, S. A. "Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics", *The B. I. I. S. S. Journal*, Vol. XII, No. 4, Dhaka.

১৩. Rob. M. A. *Resource Potentials and Geopolitical Significance of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Seminar Paper Presented at A. M. U. G. S. (September, 1991) Aligarh, India.

১৪. প্রদীপ্ত খীসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৬৭

Dhaka University Institutional Repository



১৯৯১ সালের ১লা আগষ্ট মিজোরামের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসীমা রাও সমীপে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পাহাড়ী জনগণের অমানবিক ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাহাড়ী জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধান করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে রাজি করানোর জন্য তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের ভীষণ রকমের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে ভারত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় রেখে চলেছে। বর্তমানে ভারত এশিয়ার অন্যতম শক্তি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরাশক্তি। বঙ্গোপসাগর থেকে নিয়ে ভারত মহাসাগরে ভারত নিজেকে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুস্পষ্ট ভাবে সক্ষম হয়েছে।[১৫] কিন্তু বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অত্যন্ত জোরালোভাবে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে রয়েছে (সিকিম বাদে) ৭ টি প্রদেশ- আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল , নাগাল্যান্ড, মনিপুর, ত্রিপুরা ও মিজোরাম। এই সমগ্র অঞ্চলটি ছিল স্থল বেষ্টিত *(Land Locked)*। এই ৭টি প্রদেশকে একসাথে বলা হয় 'সাতবোন রাজ্য' *(Seven Sisters statio of India)*. এই সাতটি রাজ্যে এখন স্বাধীনতাকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রচণ্ড আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে ভারতের স্বপ্ন। বর্তমানে আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ও মিজোরামে ULFA বা সম্মিলিত আসাম মুক্তি ফৌজ *(United Liberation Forces of Asam)* অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গেরিলা সংগঠনসমূহ ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয়। ভারত ঐ সব দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য সমূহে দ্রুত সরবরাহ পাঠাতে বা যোগাযোগ রক্ষায় রাখতে রীতিমত হিমশীম খায়। ভবিষ্যত কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কোনদিন নেপাল বা বাংলাদেশ অথবা চীন ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সমগ্র উত্তর পূর্বাংশের 'সাত বোন' রাজ্য সমূহকে সংযুক্তকারী মাত্র ১৮ মাইল[১৬] প্রশস্ত সংকীর্ণ 'শিলিগুড়ি করিডোর' বন্ধ করে দেয় তবে ঐ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য সহজেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এসব পরিস্থিতি

বিবেচনায় ভারতকে মরিয়া হয়ে ঐ প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত উত্তর পূর্বাংশের সাথে সমুদ্র পথের সংযোগ ঘটানোর জন্য একমাত্র উপায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর বা ঐ উপকূলীয় কোনো সুবিধাজনক স্থানকে কেন্দ্র করে সোজা উত্তর পূর্ব দিকের ভূখণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যের সংযোগ সাধনের চিন্তাভাবনার

---

১৫. Bindra. S. S. *Indo-Bangladesh Relations*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1982, pp. 92-97.

১৬. *দৈনিক ইনকিলাব*, "ভারতকে একতরফা ট্রানজিট রুট কি দেওয়াই হচ্ছে। কে বহন করবে এর ভয়াবহ পরিণাম?" রিপোর্ট, (ঢাকা, ২০শে আগষ্ট, ১৯৯৬)

Dhaka University Institutional Repository



দ্বারস্থ হতে হয়। তাছাড়া ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে ভারতের এ অঞ্চলটির (সাত বোন রাজ্য) কৌশলগত এবং ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতা বিশেষভাবে ধরা পরে। চীন মাত্র ২/৩ দিনের মধ্যে বৃহত্তর আসামের সম্পূর্ণ উত্তরাংশ (ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ) কব্জা করে নেয়। তাছাড়া নেপাল কিংবা বাংলাদেশ ভবিষ্যতের এ ধরণের সংঘর্ষে চীনের পক্ষ নিলে ভারতের ঐ অসুবিধাজনক ভূ-কৌশলগত অঞ্চলটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে যেতে পারে।[১৭] এসব দিক চিন্তাকরে ভারতকে সহজেই বঙ্গোপসাগরের অগভীর দক্ষিণ চট্টগ্রাম উপকূলে ভাসমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করে মাত্র ১৩/১৪ কি. মি. বাংলাদেশী ভূমির উপর দিয়ে চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে তার অন্যান্য রাজ্যসমূহে পৌঁছানো সম্ভব ও সহজতর হবে বলেই চট্টগ্রাম বন্দরকে ট্রানজিট হিসেবে পাওয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাছাড়া ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ৬০০/৬৫০ কি. মি. ইউনান সীমান্ত থেকে ভবিষ্যতে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করতে হলে ঐ একই পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা ভারত মোটেই সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং প্রারম্ভেই নিজের দখলদারী এবং অধিকারের পথ ভারতকে করে নিতে হয়। তাই ভারতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমেই সামরিক সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন পণ্যাদি আমদানী রফতানী করা, যাতে করে সহজেই সে সাত বোন রাজ্যের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমন করতে পারে। ভারতের এই ভূ-কৌশলগত স্বপ্নকে সফল করার জন্য ভারত তাই এতদিন ধরে সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সশস্ত্র সংগঠন 'শান্তিবাহিনী'কে সব ধরণের সহায়তা দিয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় অর্ধ লক্ষ উপজাতীয় শরণার্থীদেরকে ভারতীয় ভূখণ্ডে আশ্রয় দান এবং বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীদের কাছে আত্মসমর্পণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের বর্ণনা ও তাদের জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ও ব্রান্ড দেখে ভারতের সরাসরি সংযোগের[১৮] প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৯৬ সালের ২৫ শে এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জাতীয় সম্মেলন' এ [১৯] প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "নিজেদের অস্থির ঘর সামলাতে গিয়ে অপরের ঘরে আগুন দেবেন না।" প্রফেসর হারুণ-অর-রশিদ বলেন, "রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই। প্রতিবেশীদের ভিতর সমস্যা সৃষ্টি করে তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখা ভারতের কৌটিল্য পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম

---

১৭. Sukhwal, B.L., *India : A Political, op. cit., pp. 219-223.*

১৮. Rahman M, *The Problems Behind The National Consensus*, (In Bengali), B. I. I. S. S. papers-12, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, Dhaka, p. 39.

১৯. *দৈনিক ইনকিলাব*, "চাকমা-বাঙালী সমঅধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়ভাবে সমস্যার সমাধান চাই" রিপোর্ট, (ঢাকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



দর্শন।" সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের বলেন, "সম্প্রতি ব্যাংকক সম্মেলনে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা সহ চারটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাদের আয়োজনে সহযোগীতা করেছে। এ ছাড়া বর্তমানে প্রত্যাবাসিত চাকমা শরণার্থীদেরকে ভারত চার কোটি রুপী দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে।" প্রফেসর ড. আব্দুর রব বলেন, "ট্রানজিট, উপ-আঞ্চলিক জোট, এশিয়ান হাইওয়ের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একই সূত্রে গাঁথা। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভূ-রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে।"

এভাবে দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তথা বাংলাদেশের জাতিগঠন কার্যক্রমে শান্তিবাহিনীর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এক মারাত্মক বিপর্যয় এনে দিয়েছে। আর এর পিছনে অন্যান্য কারণের সাথে বিদেশী শক্তির স্বার্থগত কারণ যে জড়িত তা উপরের আলোচনায় স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে।

গণচীনের রাজনৈতিক স্বার্থ ও ভূমিকা :

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজের পতনের পর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে এবং এশিয়াতে বিপুল ক্ষমতাধর হিসেবে চীনের অভ্যুদয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এর শত্রুতার এশিয়ায় নতুন রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রধান শক্তি হওয়া সত্ত্বেও চীন ভারত মহাসাগরের নীল জলভাগে ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারণে সরাসরি প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে এশিয়ায় তার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত স্বীয় প্রভাব ও প্রবল প্রতাপে নিজকে ভারত মহাসাগরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।[২০] ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশিতে প্রবেশ করতে হলে চীনের নিকটতম সংযোগ মায়ানমারের উত্তর পূর্ব সীমান্তের ইউনান প্রদেশ থেকে যাত্রা করে সোজা দক্ষিণ পশ্চিম এবং পরবর্তীতে পশ্চিম হয়ে প্রায় ৭০০ কি. মি. অত্যন্ত দুর্গম পার্বত্য এবং বনাবৃত জনবিরল মায়ানমার ও ভারতীয় (উ: পূ:) ভূ-ভাগ অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এখান থেকে সহজেই মাত্র ৫০/৬০ কি. মি. চট্টগ্রাম বন্দর বা দক্ষিণে আরো কম দূরত্বে বঙ্গোপসাগরের কূলে পৌঁছাতে পারবে।

এক্ষেত্রে মায়ানমার (বার্মা) ভারত এবং বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় মঙ্গোলীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো নৃতাত্ত্বিক স্বগোত্রীয় চীনাদের সহজেই বরণ করে নিতে পারে। মায়ানমারের উত্তরাংশের চীন, আরাকানী (চাকমা, মারমা ইত্যাদি), ভারতের মিজো ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলো মূলতঃ একই নৃধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মায়ানমারের ঐ অঞ্চলের কারেন, কাচিন, শান জনগোষ্ঠী এবং ভারতের ULFA এবং অন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর কম্যুনিষ্ট গেরিলা তৎপর রয়েছে।[২১] নাগা লুসাই, মনিপুরী এবং আসামী সকল

---

২০. Susha B. B., *Indo-Bangladesh maritime Boundary Issue*, Strategic Analysis, 1977.

২১. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি*, *Op. cit.*

Dhaka University Institutional Repository



গেরিলাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শান্তিবাহিনী'র একটি বড় অংশের সংযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীর পূর্বসূরী 'জনসংহতি সমিতি' মূলতঃ চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত একটি দল ছিল।[২২] ভারতের উত্তর পূর্বাংশের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মায়ানমারের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমাংশ নিয়ে স্থানীয় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীসমূহ একটি বৃহৎ 'কনফেডারেশী' ধরণের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চায়।[২৩] পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে বিভিন্ন আঞ্চলিক গেরিলা এবং কম্যুনিষ্ট গ্রুপসমূহের সাথে সংযোগ রয়েছে বলে জানা যায়।[২৪] তাই বাস্তব ভূ-রাজনৈতিক তাগিদে দূরবর্তী চীন ঐ সকল কম্যুনিষ্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর সম্ভাবনাময়গুলোকে একত্রিত, সংগঠিত এবং প্রশিক্ষিত করে এদের তৎপরতার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়।[২৫]

তাৎপর্যময় ভূ-রাজনৈতিক বা অবস্থানগত কারণে বিশ্বের দুই উদীয়মান শক্তি ভারত এবং চীনের কাছে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই পার্বত্য অঞ্চলটি নিজ নিজ ঈপ্সিত বলয়ে প্রবেশের সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্বাচিত প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচ্য। আর ভূ-রাজনীতির খেলার এই যাতাকলে পড়ে বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়া মারাত্মক ভাবে ব্যহত হচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর দেশ গঠন কার্যক্রমের সাথে সাথে জাতিগঠন কার্যক্রম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলেও '৭৫ পরবর্তী সময়ে দেশের এক দশমাংশ সার্বভৌম এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশী মদদে যে ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে এই দীর্ঘ সময় ধরে সেই ক্ষয়িষ্ণু জাতিগঠন কার্যক্রম বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হয়নি।

---

২২. Amin M. N., *Secessionist Movement*, op. cit.

২৩. Burman D. C., "Regionalism in Bangladesh : The Study of Chittagong Hill Tracts", *Regionalism in South Asia*, (ed. by Ramakant), Asia Studies centre, Aalekh Publishers, Jaipur, India, pp. 116-137.

২৪. Sukhwal, B.L., *India : A Political*, op. cit.

২৫. ড. মোহাম্মদ আবদুর রব, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি*, Op. Cit.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

# জাতিগঠন ও সাংস্কৃতিক সংহতি

## ৬.১ মৌলিক উপাদান হিসেবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

কোন কিছুর অভ্যুদয় এর ধারাবাহিকতা কিংবা পরিণতি ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ইতিহাসের যোগসূত্র ধরেই ঘটনাসমূহ পরিব্যপ্ত। আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রসার পর্যন্ত অসহায় মানুষের নিরাপত্তাবোধ এবং মানবিক ধারাবাহিকতার চেতনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের। হোমি ভাবার মতে, এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই জাতিগঠনের মৌলিক উপাদান।[১] আসলে নিজস্ব সংস্কৃতি ব্যক্তি মানুষের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে এই কারণে যে, এর মাধ্যমে সে ব্যাখ্যাগত সিদ্ধান্ত তৈরী করে নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। হাবেরমাসের মতে, এই ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে 'পরম্পরাগত আন্তঃসম্পর্ক'।[২] হেগেলও বলেছেন, এই পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা।[৩] আর এভাবেই কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সম্মিলিত স্বাতন্ত্র্যবোধের কাঠামো গঠিত হয়ে থাকে। এই কাঠামো কিংবা সম্পর্ক গঠিত হয় ধীরে ধীরে, দীর্ঘ সময়-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির এক নিজস্ব পরিমণ্ডল। সাংস্কৃতিক এই ধারাটি বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বোধ থেকে ঐতিহাসিকভাবেই আবার সম্পূর্ণ পৃথক।

পার্বত্য অধিবাসীদের এই অঞ্চলে প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। "ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বার্মার উত্তরাঞ্চল থেকে আরাকান হয়ে এই অঞ্চলে আসে। কুকি গোত্রের উপজাতীয়রা অর্থাৎ লুসাই, পাংখু, মোরো ও খুমীরা প্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এরপর ত্রিপুরা গোত্রীয় বিভিন্ন উপজাতি যেমন: ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গা ও রিয়াংরা এ অঞ্চলে আগমন করে। সর্বশেষে আরাকানী গোত্রীয় চাকমা ও মগরা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে।[৪] এর পরের ইতিহাস থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়

---

১. হোমি ভাবার প্রবন্ধ- "Dissemi Nation : Time Narrative and the Margins of the Modern Nation", *The Location of culture*, London : Routtedge, 1994, pp. 139-170.

২. মাসুদুজ্জামান এর প্রবন্ধ- *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদ*, বোয়ালখালী খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত পত্রিকা *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- যুরগেন হাবেরমাসের Kultur und Kritik Frankfurt / Main, 1973 এবং ড. হেনরিক ও যুরগেন হাবেরমাস সম্পাদিত *Zwei Reden*, Frankfurt / Main, 1974 গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা "Konnen Komplexe Gesellschaften eine verunftige identitat ausbilden?"

৩. মাসুদুজ্জামান এর প্রবন্ধ- *op. cit., p. 84*

৪. ফেরদৌস হোসেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ব্যবস্থা : ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্তমান পর্যায়", *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সংকটের স্বরূপ*, ঢাকা, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository



যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে মুঘল, ব্রিটিশ, আরাকানী, ত্রিপুরী ইত্যাদি রাজশক্তির সাম্রাজ্য কখনোই পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারেনি। বৈচিত্র্যে মণ্ডিত এবং বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময়-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পার্বত্য অধিবাসীরা আজ একক জাতিসত্তায় পৌঁছেছে। যা তাদেরকে 'জুম্ম জাতি' নামে চিহ্নিত করেছে এবং এভাবেই তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে একটি ভিন্ন সংস্কৃতির। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পাশাপাশি নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও তৈরী করে নেয়ার প্রচেষ্টায় তারা রত।

ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের লক্ষ্য থাকে ভিন্ন। পার্বত্যবাসীদের আলাদা সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, ঐতিহাসিকভাবে তাঁদের লক্ষ্যও ছিল ভিন্ন। রাজনৈতিকভাবে অধস্তন কিংবা অকেন্দ্রিক ভাবা হলেও, যা একেবারেই অনুচিত, সামাজিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনে তাঁদের কোনো বাধা নেই। পার্বত্য অধিবাসীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়, সজীব নানা জাতিগোষ্ঠী অতীত ইতিহাস এবং দৈনন্দিনতার উপর দাঁড়িয়ে বর্তমানকে অর্থপূর্ণ করে নিতে চাইছে। জাতিস্থানের মধ্যে তাদের অতীত ঐতিহ্য ও ভিন্ন সংস্কৃতির গুরুত্ব এখানেই।

### ৬.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেক্ষিত

তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের সমতল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। সাতটি উপত্যকা ফেনী, কর্ণফুলি, চেঙ্গি, মায়ানি, কাসালং, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীর মাধ্যমে বনাঞ্চল গিরিখাত ও পাহাড় নিয়েই মূলত এর ব্যাপ্তি।[৫] এই উপত্যকাগুলো সমতল ভূমির চেয়ে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তেরটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে যে সমস্ত জাতিগোষ্ঠী তাঁরা মঙ্গোলীয় ধারায় চীনা বংশোদ্ভূত এবং সমতল ভূমিতে বসবাসকরী বাঙালীদের পরিবর্তে তাদের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় উত্তর-পূর্ব ভারত, বার্মা, থাই ও মঙ্গোলীয় মানুষদের সঙ্গে।

ভাষাগত দিক থেকে তারা অধিকাংশই তিব্বতি-বার্মা ভাষাভাষী।[৬] এরা কুকি-চীন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে- বনযোগী, চাকমা, মগ, পাংখু, তঞ্চঙ্গা, কুকি, লুসাই, খমি

---

৫. Dr. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story*, Centre for Development Research, Bangladesh (CDRB) 1992.

৬. Clarence T. Maloney, "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture". in M. S. Qureshi (ed.) *Tribal Cultures of Bangladesh,* Rajshahi University, Institute of Bangladesh Studies (IBS) 1984.

Dhaka University Institutional Repository



এবং খাইয়ান। অন্যদিকে, বাকী তিনটি উপজাতি যেমন টিপরা, ম্রোয়াং এবং বাইয়াং বদোভাষা ভিত্তিকউপদলে বিভক্ত।[৭] বাংলা, পালি এবং সংস্কৃতের মিশ্রণে সৃষ্ট এক ভাষা রীতিতে কথা বলে চাকমারা, তাঁদের লিপিরূপ আবার বর্মী। ত্রিপুরীরা কথা বলে কাচারি ভাষার সাথে মিল আছে এমন এক ভাষায়, মারমাদের বাচন আবার আরাকানীয়। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা যেখানে উপভাষাসংক্রান্ত সামান্য বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলা, সেখানে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর ভাষা একেবারেই পৃথক। এমনকি তাদের নিজেদের মধ্যেও নেই ভাষিক কোন ঐক্য।

ধর্মের দিক থেকেও পার্বত্য অধিবাসীরা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম পরিচয়ে চিহ্নিত। চাকমা, মারমা, চাক, খিয়াং ও তঞ্চঙ্গারা বৌদ্ধ; ত্রিপুরী ও রিয়াংরা হিন্দু; লুসাই, পাংখু ও বনযোগীরা খৃষ্ট এবং অন্যরা প্রকৃতি পূজারী।[৮]

উৎপাদন পদ্ধতি এবং জীবন যাপনের দিক থেকেও পার্বত্য অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়। 'জুম চাষ' শুধু যে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যম তা-ই নয়, চাষাবাদের প্রথাগত ও টেকসই রীতি হিসেবেও প্রমাণিত।[৯] স্বভাবতই যা ছিল প্রত্যাশিত, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি পাবে পার্বত্যবাসীরা; সেই স্বীকৃতি তারা পায়নি। রাষ্ট্র সম্পর্কিত আধুনিক যুক্তিকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁদের উপর।

কোন জাতির স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির জন্য তার সাংস্কৃতিক পরিসীমাকে বুঝে নেয়া জরুরী। এই চিহ্নায়ন মূর্ত অথবা বিমূর্ত হতে পারে। সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার সূত্রটি এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ফলে সময়ের একত্ব তৈরী হয়, নির্দিষ্ট স্থানিকতা পায় একক ঐতিহ্যের রূপ, জনসাধারণ বাঁধা পড়ে একসূত্রে।[১০] নিজেদের মধ্যকার নানা বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য আদিবাসীরা একটি মূল লক্ষ্যকে সমনে রেখে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহমর্মিতাবোধ বজায় রাখতে পেরেছে, যা তাঁদেরকে ধীরে ধীরে একটি একক জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত করে তুলেছে। আর এ জন্য তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট ভূপরিসীমা, একই ধরনের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। পার্বত্য অধিবাসীদের সাম্প্রতিক উক্তি থেকেও বোঝা যায় নিজেদের জাতিগত পরিচয়, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়সংক্রান্ত ভাবনাকে তারা পূনর্গঠিত করে নিয়েছেন।

---

৭. G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India* Vol. III, part II, Part III Calcutta, 1903.
৮. মাসুদুজ্জামান এর প্রবন্ধ- *op. cit.*
৯. ভূমিত্র চাকমা, "পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত জাতীয়তাবাদ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, আগষ্ট, ১৯৯৩
১০. হোমি ভাবার প্রবন্ধ- *Dissemi Nation : Time Narrative*, *op. cit.*, p. 148.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382761

Dhaka University Institutional Repository



আধুনিকতা বলতে মনে করা হয় নির্দিষ্ট জাতিস্থানের মধ্যে সহাবস্থান করবে সব সম্প্রদায়। যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য জাতি সৃষ্টির মৌলিক উপাদান তারও লক্ষ্য হচ্ছে মূল স্রোতের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের বাইরে 'অন্য' যাঁরা আছেন তাঁরা যাতে সমগ্রতার শিকার হয়ে তাঁদের জাতিসত্তাকে হারিয়ে না ফেলেন তা নিশ্চিত করা।[১১] এ প্রসঙ্গে হোমি ভাবা আরও বলেছেন, যদি কোন রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে মেনে না নিয়ে একে একত্রে বেঁধে ফেলতে চায়, তাহলে সেই রাষ্ট্র আধুনিক হতে পারে না।[১২] কিন্তু বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আদিবাসীদের সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দেখি একদিকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশকে যেভাবে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট রয়েছে ততটা সময় এবং খেয়াল দেয়নি জাতিকে আধুনিকতার পর্যায়ে টেনে নেয়ার। ফলে দেখা দিয়েছে বৈপরীত্য। একটি আর একটিকে ছাড়া রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। ১৯৭৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ একভাষা ও এক সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয় রাষ্ট্র'-এই প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এর স্বাভাবিক প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "..... আমি একজন চাকমা। একজন মারমা কখনো চাকমা হতে পারে না। একজন চাকমা কখনো বাঙ্গালী হতে পারে না। আমি একজন চাকমা, আমি বাঙ্গালী নই। আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক- বাংলাদেশী। আপনিও একজন বাংলাদেশী কিন্তু আপনার জাতীয় পরিচয় বাঙ্গালী। ..... তারা (পাহাড়ীরা) কখনো বাঙ্গালী হতে পারে না।"[১৩]

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদের এক অধিবেশনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন, "এ সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের কথা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগণ ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমল হতে নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, আমাদের জাতিসত্তার কথা ভুলে যাওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করতে চাই। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিসত্তার স্বীকৃতি রয়েছে। আমি সংবিধানে উপজাতীয় জনগণের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"[১৪]

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মৌলিক যে কল্যাণবোধ থেকে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, স্বার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে সেই বোধকেই আজ অপসৃত করা হচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো ও প্রযুক্তির ঘেরাটোপে আটকে যাওয়ায়

---

১১. *op. cit.*, p. 162.
১২. *op. cit.*, p. 169.
১৩. Dr. Mizanur Rahman Shelley, *The Chittagong*, *op. cit.*, p. 110.
১৪. প্রদীপ্ত ঈসা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৪৯

Dhaka University Institutional Repository



মানুষের মুক্তি ঘটেনা, প্রান্তবর্তী পাহাড়ী মানুষদেরতো নয়ই।[১৫] এজাজ আহমদ-এর মতে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে উপনিবেশের অধীন কোনো কোনো দেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হলেও উপনিবেশ-উত্তর কালে দেশটির কর্তৃত্ব চলে গেছে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে।[১৬] ফলে যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অর্জন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তীতে সেই সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের খপ্পড়েই পড়তে হয়েছে সেনাবাহিনী, সংসদ, বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক দল ইত্যাদির মাধ্যমে। আর এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ এবং লাভবান হচ্ছে এলিট শ্রেণী।[১৭] পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা 'বাঙালী' না 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী' এই উদ্ভট ধারণার প্ররোচনায় রাষ্ট্র সামরিক, প্রশাসনিক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে সৃষ্টি করেছে জটিলতা এবং আপোষহীন সংকট। ফলে ঐতিহাসিক জাতিগত ধারণার সঙ্গে বিরোধ ঘটছে একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে যাপিত সাংস্কৃতিক দিক থেকে পৃথক, প্রান্তবর্তী নানা মানবগোষ্ঠী । বাংলাদেশে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন তাঁরা কখনোই পার্বত্য অধিবাসীদের স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে বোঝার কিংবা গ্রহণ করার চেষ্টা করেননি। আর এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এগিয়ে এসেছেন, তৈরী করতে চেয়েছেন Counter Discourse এরকম পরিস্থিতিতে আচরণিক অভিজ্ঞানে সশস্ত্র হয়েও উঠছেন তাঁরা। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন তাঁরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে পার্বত্যবাসীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে মেনে নিয়ে জাতিস্থানের মধ্যে জায়গা করে দিতে পারতেন তাহলে হয়তবা পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যা গভীরতর হতো বলে মনে হয়না। মিশেল ফুকোর মতে, সামাজিক সমগ্রতার মধ্যে প্রান্তিক সংযোগ সূত্রেও ব্যক্তিমানুষ আধুনিক রাষ্ট্রে তার স্থান করে নেয়।[১৮]

জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরণের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু কিছু পশ্চিমী পরিভাষা যেমন, সংখ্যালঘিষ্ঠ, বহিরাগত, প্রান্তবর্তী, বিকাশমান ইত্যাদি শব্দগুলো আমাদের জন্য প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এগুলো আবার আমরা প্রয়োগ করছি প্রান্তবর্তী মানুষদের ক্ষেত্রে। প্রান্তবর্তী মানুষ কতদূর পর্যন্ত এসব মেনে নিতে প্রস্তুত তা উল্লেখ করতে যেয়ে ফ্রয়েড বলেন, "বড় কোন জনগোষ্ঠী ছোট জনগোষ্ঠীর মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালবাসায়

---

১৫. মাসুদুজ্জামান, *op. cit.*, p. 88.

১৬. Aijaz Ahmad, *Literature among the signs of our time, in theory*, Bombay : Oxford University Press, rept 1933, p 28.

১৭. Edward W. Said, *Resistance and Oppositio, Culture and Imperialism*, New York : Alfred A. Knopt, 1993, p. 264.

১৮. Michel Foucault, *What are we today*? Technologies of the self, (ed.) H. Gutman, London : Tavistock 1988.

Dhaka University Institutional Repository



বেঁধে রাখে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের (বড় গোষ্ঠীর) উগ্রতাকে মেনে নেয়। জনগণের মধ্যে এ অবস্থায় ভালবাসা এবং ঘৃণা একই সঙ্গে অবস্থান করে।"[১৯]

এ তত্ত্বের প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের উগ্র আচরণকে যখন আর মেনে নিতে পারেনি তখনই শাসক গোষ্ঠী পার্বত্য এলাকায় বাঙালী পুনর্বাসন কিংবা সামরিক, প্রশাসনিক খরবদারির মাধ্যমে সৃষ্টি করে অবদমন প্রক্রিয়া। শুরু হয় সংঘাত। ভালবাসার স্থলে জায়গা পায় ঘৃণা। একের প্রতি অপরের ঘৃণার ফলে জন্ম নেয় সশস্ত্র তৎপরতা। দেখা দেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা। জাতিগঠন প্রক্রিয়া আবারও ব্যাহত থেকে যায়। স্বার্থ এবং অস্তিত্বের মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশে পার্বত্য অধিবাসীদের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন ও তার সমাধানে এগিয়ে আসেনি কোনো সরকার। রাজনীতি শেষ কথা হলেও সামরিক পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে বার বার। ফলে রাজনীতিতে কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পার্বত্য জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ঘটেনি। বরং শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাল্টা ডিসকোর্স তৈরী করে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোকে একই সুত্রে (উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে) আবদ্ধ করে 'জুম জাতি' বলে নিজেদের পরিচয়কে সম্প্রসারিত করেছে। লেভি স্ট্রাউস এর মতে, "এই অর্থ সন্ধান শুধু নিজেদের আবিস্কারের মধ্য দিয়ে নয়, অন্যদের আবিস্কারের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়।"[২০]

নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্যের ধারক পাহাড়ী উপজাতিরা তাকে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠীর স্রোতের সাথে জায়গা করে দিতে হবে। এক ভাষা অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ যেমন বিশেষ স্বাতন্ত্র্যসূচক মানসিক ঝোঁকের কারণে পশ্চিম বাংলার মানুষদের তুলনায় নিজেদের আলাদা ভাবতে পারে। পার্বত্য অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ও আমাদের অনুরূপ মর্যাদা দিতে হবে। এতে আমাদের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বৈ শূণ্য হবেনা।

---

১৯. মাসুদুজ্জামান, *op. cit.*, p. 94.

২০. মাসুদুজ্জামান এর প্রবন্ধ- "পার্বত্য চট্টগ্রাম : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদ", বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত পত্রিকা *সমাজ নিরীক্ষণ*, নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- Claude Levy-Strauss, *Introduction to the work of Marcel Mauss, Trans, Felicity, Baker*, London : Routledge, 1987, p. 35.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

# বাংলাদেশে জাতিগঠনের সমস্যায় পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

## ৭.১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতিগঠন

Esman এর মতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি হল 'ব্যাপকভিত্তিক ও সুপ্রসারিত সমাজকল্যাণ।'[১] অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে চরম দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে ক্ষুধা, অপুষ্টি, ব্যাধি, আশ্রয়হীনতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি উন্নয়নের প্রাথমিক লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন নীতির মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে ও সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য জাতীয় সম্পদের উদ্‌যোজন করা হচ্ছে।[২] অবাক হবার কথা এই যে, এসব সামাজিক ব্যাধির জন্ম হচ্ছে জাতীয় পরিকল্পনার ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য নয়, বরং তার সার্থক বাস্তবায়নের জন্য। অন্য কথায়, এক ধরণের বৃদ্ধিই এর জন্য দায়ী।[৩] ডাডলি সিয়ারসের *(Dudley Seers)* মতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্য হওয়া উচিত তিনটি; (ক) দারিদ্র দূরীকরণ, (খ) বেকারত্বের অবসান ও (গ) ন্যায় সঙ্গত বন্টন।[৪] অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কিভাবে অর্জিত হবে এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেন, কিন্তু তাদের সুপারিশে বন্টন ব্যবস্থার প্রতি তেমন গুরুত্ব নেই। বন্টন ও অনুরূপ সমস্যা মূলতঃ রাজনৈতিক আর এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ হয় রাজনৈতিক এলিটদের দ্বারা।[৫] নীতি স্বয়ংক্রিয় কোন ব্যবস্থা নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমন কতকগুলো কাঠামোগত, কার্যগত ও আচরণগত *(structural, behavioral and attitudinal)* প্রতিবন্ধক রয়েছে যা সমাজে পরিবর্তনের তথা ন্যায়সঙ্গত বন্টনের পথ রুদ্ধ করে।[৬] এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উপেক্ষা করে সঠিক অর্থনীতি গড়ে তুললেও কালে তা সঠিক থাকেনা বরং কালক্রমে তা

---

১. Milton J. Esman, "The politics of Development Administration" in John. D. Montgomary and William J. Siffin, (eds.) *Approaches to Development : Politics, Administration and Change,* (New York : 1966) pp. 59-60.

২. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ - *বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭

৩. Bertram M. Gross, "Destructive Decision Making in Developing Countries". *Policy Sciences*, V (June, 1974), No. 2 p. 214.

৪. Dudley Seers, *The Meaning of Development international Development.* Review, Vol. XI, No. 4, pp. 2-6.

৫. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, *op. cit.*, p.18

৬. Arun Shourie, *Growth poverty and Inequalities,* Foreign Affairs, (January, 1973), pp. 340-352.

Dhaka University Institutional Repository



বিস্ফোরক রাজনীতির জন্ম দেয়।'[৭] আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে এ উক্তির যথার্থতা নিরূপিত হবে। আসলে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক সংগঠন একে অপরকে প্রভাবিত করে ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সুতরাং উন্নয়ন কর্মসূচী এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ওঠে। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে ও ভবিষ্যৎ সুখের ভিত্তি সুদৃঢ় করে কালক্রমে বিভিন্ন গ্রুপ ও গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্ষম। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ অল্প সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংহতি দূর করতে সক্ষম হয়নি।[৮] তাই এসব নতুন দেশের নেতৃবর্গের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের 'আদিম অনুভূতিগুলোকে' *(Primordial Sentiments)* 'পৌর অনুভূতিতে' *(Civil Sentiments)* রূপান্তরিত করা। সংকীর্ণ একাত্মবোধের উর্ধ্বে এক জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা আর বহুসংখ্যক গ্রুপ ও গোষ্ঠীর উর্ধ্বে এক জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা।[৯] তবে অবশ্যই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এক বৃহৎ জাতিসত্তার 'অস্তিত্ব কল্পনা করা যাবেনা। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র গ্রুপ ও গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যকে হরণ করে এক জাতীয়রাষ্ট্র গঠন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আর এই সংঘাতের রেশ ধরেই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দূরবস্থার কারণে জাতিগঠন প্রক্রিয়া সমস্যায় নিপতিত হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এখানে অধিকাংশ জনগণই দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে। মাথাপিছু আয় অত্যন্ত সামান্য, মাত্র ৩২০০ টাকা (১৫০ ডলারেরও কম)।[১০] অধিকাংশ জনগণই নিরক্ষর।[১১] মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০.২ ভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ও ৫ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৩ ভাগ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। জনস্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক, যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত উচ্চ।[১২] এ হার ১৯৮১ সালে ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ। বেকারত্বের অভিশাপে এক বিরাট জনসমষ্টি অভিশপ্ত আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে

---

৭. K. B. Sayeed, *Power Elite's, Public Policies and Political Systems in south Asia,* Kingston, 1973, p. 13.

৮. W. Howard Wriggins, "Impediments to unity in new Nations : The case of Ceylon", *The American Political Science Review, Lv* (1961) p. 320.

৯. Clifford Geertz, "The integrative Revolution", in Geertz, (ed.) *Old Societies and new states,* (New York : Free Press, 1963), p. 109.

১০. Government of the people's Republic of Bangladesh, Ministry of planing, Bangladesh population census Report, 1974 National Vol. (Dhaka : 1977), p. 27, Table 26 and 27.

১১. Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Finance, Bangladesh Economic Survey, 1977-78 (Dhaka : 1978) p. 1.

১২. *Ibid.*, p. 8, Table 1.

Dhaka University Institutional Repository



অসাম্য অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। কৃষিই হচ্ছে শতকরা ৭৫ জনের জীবিকার একমাত্র উপায়, কিন্তু কৃষিখাত আজও সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত। আধুনিকতার আলো শহরাঞ্চলে লেগেছে বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চল যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়েছে। যদিও গ্রামাঞ্চলেই বাংলাদেশের শতকরা ৮৪ ভাগ জনগোষ্ঠী বাস করে।[১৩] ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী প্রতি কিলোমিটার জনবসতির ঘনত্ব ৫৯০ (প্রতি বর্গমাইলে ১৭০০ এর উপর)।[১৪]

ক্ষুদ্রায়তন এ রাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে বেশী সংখ্যক উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থাও প্রকট আকার ধারণ করে। সমতল ভূমির বৈশিষ্ট্যের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান বিভিন্ন কারণে আজ জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির মুখ্য আলোচনায় স্থান পেয়েছে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার প্রেক্ষিতে সেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত থেকে জাতীয় একাত্মবোধের বৈপরীত্যে অবস্থান নিয়েছে। যে সমস্ত প্রধান সমস্যাগুলো পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে কাঁপিয়ে তুলেছে এবং যার প্রভাবে বাংলাদেশের জাতিগঠন সমস্যা আরো শক্তভাবে বেড়ে উঠেছে তার মধ্যে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প, বহিরাগত বাঙালী পুনর্বাসন, ভূমির অধিকার বিষয়ক সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দূর্বলতা, উপজাতি শরণার্থীদের নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বাংলাদেশের জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ বিধৃত হল।

বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য ছাড়াও আর্থ-সামাজিক কারণগুলোও অত্যন্ত প্রবল আকারে সক্রিয়। বিশেষ করে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ, দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান ভূমির অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা এবং এতদঞ্চলে বহিরাগত বাঙালীদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ীদের সাথে তাদের যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে উপজাতীয়দের জনজীবনে ক্রমান্বয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। এই অসন্তোষ নির্মূল না করে তাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার নিজেদেরকে জড়িত করে উপজাতীয়দের বিশ্বাসের সৌধকে ভেঙ্গে দেয় ফলে সমস্যাগুলো আর সমাধানের পথ খুঁজে পায়নি।

---

১৩. *Ibid.*, p. 14, Table 2.

১৪. *Ibid.*, p. 9, Table 4.

Dhaka University Institutional Repository



**৭.২ কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প :**

১৯০৬-১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের নদীতে বাঁধ নির্মাণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেন। মূলতঃ কর্ণফুলী নদীকে মানব কল্যাণের কাজে লাগানো এবং এর নিম্নাঞ্চলে সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভারত বিভাগের পূর্বেই এতে বাঁধ দেয়ার চিন্তাভাবনা করা হয়। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ই. এ. মুর তাঁর প্রাথমিক প্রতিবেদনে বরকল থানা সদরে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু এর কারিগরী ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রকল্প থেকে আশানুরূপ ফলাফল না পাওয়ার যৌক্তিক আশংকায় এটি পরবর্তীতে বাদ দিয়ে চিলাক ধাক বাঁধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এটিতেও নির্মাণ কাজের সমস্যা, জলের উচ্চতার তারতম্য, প্রকল্পের কাজের দীর্ঘসূত্রিতা, কারিগরী ত্রুটি, প্রাকৃতিক দিক থেকে অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার মি. গ্রইস প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে কর্ণফুলী নদীর সর্বনিম্ন অঞ্চলের গিরিখাতে শিলছড়িতে বাঁধ নির্মাণের পক্ষে মত দেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থান সরকারের সেচ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী জনাব খাজা আজিম উদ্দীন এর প্রতিবেদনে কাপ্তাই থেকে তিন মাইল উজানে শিলছড়ি গিরিখাতের মুখে বাঁধ নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হলেও শেষ পর্যন্ত কাপ্তাই খালের মুখের কাছেই বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিক এই বাঁধটি কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্পের অধীনে নির্মিত এবং এটি কাপ্তাই বাঁধ নামে এবং উক্ত বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট জলাধার কাপ্তাই হ্রদ নামে পরিচিত। প্রথমদিকে এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা কিন্তু কাজ সমাপ্ত করতে ব্যয় হয়েছিল দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৮ কোটি টাকার ও অধিক।[১৫]

**এই বাঁধ নির্মাণের ক্ষতিকর দিকসমূহ :**

পৃথিবীর আদিমতম কৃষি পদ্ধতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষ অন্যতম। এটি উপজাতীয়দের অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি এবং বংশানুক্রমিক পেশা। নিওলিথিক যুগে প্রায় ৯/১০ হাজার বছর পূর্বে এই পুরানো কৃষি ব্যবস্থা অষ্ট্রেলয়েড জনগোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা এ দেশে প্রবর্তিত হয়।[১৬] আনুমানিক খৃষ্টের জন্মের ৩০০০ থেকে ১৩০০ পূর্বাব্দ সময়সীমার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই কৃষির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামই একমাত্র অঞ্চল যেখানে এই আদিম কৃষি পদ্ধতি 'জুম চাষ' এখনও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এই জুমচাষে নেমে আসে বিপর্যয় । বাঁধের দরুণ যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় তার

---

১৫. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে*, op. cit., pp. 30

১৬. প্রদীপ্ত খীসা, *'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা'*, op. cit., pp. 27

Dhaka University Institutional Repository



ফলে ১২৫ টি মৌজার প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয়। ৫৪,০০০ একর আবাদী জমি অর্থাৎ জেলার চাষাবাদযোগ্য মোট জমির ৪০% ডুবে যায়। এর ফলস্বরূপ ১০,০০০ হালচাষী এবং ৮০০০ জুম চাষী পরিবারের এক লক্ষেরও অধিক লোক অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৭] পরবর্তীতে বাঁধের কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া উপজাতীয়দের তুলনামুলক ভাবে নিম্নমানের ২০,০০০ একর আবাদী জমিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হলেও ৩৪,০০০ একর আবাদী জমি হতে উপজাতীয়রা বঞ্চিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১৮,০০০ পরিবারের মধ্যে ১১,৪৬১ টি পরিবারকে কোনোভাবে পুনর্বাসিত করা হলেও ৬,২৩৯ টি পরিবারের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[১৮] ফলে ১৯৬৪ সালে লংগদু, বরকল ও বাঘাইছড়ি থানার পুনর্বাসন এলাকা থেকে প্রায় ৫০ হাজার পাহাড়ী ভারতে চলে যায়। তন্মধ্যে ২০,০০০ চাকমা উদ্বাস্তুকে তৎকালীন ভারত সরকার বর্তমান অরুণাচল রাজ্যে পুনর্বাসিত করে। অন্যরা ত্রিপুরা সহ অন্যান্য রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে হ্রদ এলাকার ধানী জমির পরিমান ২১,৫২২ একর *(Fringe land)* বা জলমগ্ন জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ হাজার একর। জলে ভাসা জমিতে চাষ চললেও তা বাঁধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছায় জমির ফসল নষ্ট হয় বেশী।[১৯]

কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। আর ঠিক সে সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্যায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করলে জমির উপর কি পরিমান চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা অনুমান করা যায়। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬ শতাংশ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত এই হার ছিল ৩.৪। অথচ ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ছিল মাত্র ১.৬৩ শতাংশ।[২০] কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই দুই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে কৃষি জমির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে জেলার অধিবাসীদের একটি বড় অংশ জীবন ধারণের জন্য অধিক পরিমাণে জুম চাষের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধের কারণে জুম চাষের উপযোগী আবাদী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের জাতিগঠনে পার্বত্যবাসীদের এই দুর্দশা সমস্যাকে অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল রেখেছে।

---

১৭. আলমুট মে, *দি ইকোনমি অব শিফটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ,* (মিমি ও বার্লিন, ১৯৭৮)

১৮. সৈয়দ নাজমুল ইসলাম, "দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ইন বাংলাদেশ ঃ ইন্টিগ্রেশনাল ক্রাইসিস বিটুইন সেন্টার এন্ড রেফেরী" *এশিয়ান সার্ভে,* ভল্যুম ২১, নং ১২, ডিসেম্বর, ১৯৮১

১৯. বিপ্লব চাকমা, op. cit., pp. 12

২০. জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে,* op. cit., p. 32.

Dhaka University Institutional Repository



আবাদী জমির অভাব এবং জুম চাষ কমে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয়দের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে উপজাতীয়দের নতুন নতুন জীবিকার দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে। উদ্যান কৃষি, মৎস্য শিকার, কারখানায় কাজ সহ ছোট ছোট কাজের মধ্যে জড়িত থেকে তাদেরকে কঠিন কষ্টক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। জুম চাষের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে হাল-কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য ভূমির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে রাবার চাষ, ফল চাষ ও কাঠের গাছ চাষে সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এসব পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে চাষ ব্যবস্থার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণকে চার ভাগে ভাগকরা হয়েছে।[২১]

যেমন :

১। জুম চাষ বা পালাক্রম চাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী

২। প্রধানত পালাক্রম চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

৩। প্রধানত হাল-কৃষি এবং উদ্যান চাষের উপর নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী এবং

৪। হাল কৃষি ও উদ্যান চাষের উপর প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পার্বত্যবাসী।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তা ছিল নামমাত্র। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান সরকার স্থানচ্যুত জনগণের পুনর্বাসনের জন্য ৫ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার বরাদ্ধ করলেও প্রকৃতপক্ষে কাজটির জন্য ব্যয় করা হয় মাত্র ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। আর সঠিকভাবে পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।[২২]

১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক আর, আই, চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি জনমত যাচাই কমিটি আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জরীপ কার্য চালায়। জরীপের ফলাফলে দেখা যায় যে, চাকমাদের মধ্যে ৬৯ শতাংশের ধারণা কাপ্তাই বাঁধ তাদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ৮৯ শতাংশ বলেছে তারা বাঁধের কারণে নিজেদের ভিটে বাড়ী ও জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, শতকরা ৮৭ জন বলেছে উচ্ছেদ হয়ে নতুন বসত বাড়ী নির্মাণ করতে তারা ভীষণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, শতকরা ৬৯ ভাগ লোক অভিযোগ করেছে পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ তারা পায়নি এবং সরকারী কর্মচারীরা এ ব্যাপারে কারচুপি করেছে, ৭৮ শতাংশের অভিযোগ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তাদের জন্য কোনো চাকুরীর সুযোগ ছিলনা। বরং

---

২১. হাবিবুর রহমান, "পার্বত্য-বাংলাদেশের জুম চাষ", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, (একবিংশ সংখ্যা, জুন, ১৯৮৮)

২২. ডেভিড সোফার, "পপুলেশন ডিসলোকেশন ইন দি হিল ট্রাক্টস্", *দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ ৫৩*, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৬২

Dhaka University Institutional Repository



কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ হওয়ার আগে তার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভালই ছিল এই অভিমত ব্যক্ত করেছে শতকরা ৯৩ জন লোক।[২৩]

এ প্রসঙ্গে জল ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক এম. আই, চৌধুরীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, *"Before the dam was constructed a through study of the area likely to be submerged by water, was made. But as the survey sheets, which were available, were not accurate and reliable, it misled the engineers therefore, after the dam was constructed and water held, it was found that about double the area was submerged than calculated.*

*Moreover, after the lapse of a period of time, it was found that more area of rich tropical forest were affected by capillary water. And the area thus affected was considerable ... ...*

*Along the rivere Vallies Myni, Kasalon, and Karnafully large tract of agricultural land was also submerged. The settlements of the tribal people, Chakma, Murung, Kokis, Tipras etc. Were badly disturbed and they migrated to other places and resettled.* [২৪] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উপজাতি বিদ্রোহ শুরু হয় কাপ্তাই বাঁধের দ্বারা সৃষ্ট অসন্তোষ, তার অন্যতম প্রধান কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্প কলকারখানার মধ্যে বেশীর ভাগই বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কর্ণফুলী পেপার মিল এবং কর্ণফুলী রেয়ন মিল এ দু'টি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ শিল্প কারখানা। চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত এ দু'টি কারখানায় প্রায় ৬ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এ ছাড়া সেখানে ৫টি মাঝারি ধরণের ইন্ডাষ্ট্রি, ১ টি সিগারেট ফ্যাক্টরী, ১টি টেক্সটাইল মিল, একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরী সহ কাঠজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ কারখানায় যে সব শ্রমিক কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত তাতে পাহাড়ী উপজাতিদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক ভাবে কম।

ভূতপূর্ব জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইনের মতে, এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র কারণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীনতা। ১৯৫০ সালে চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ পেপার মিলে

---

২৩. R. I. Chowdhuri and others, *Tribal Leadership and Political Integration,* Chittagong University, 1979.

২৪. Prof. M. I. Chowdhuri, "Kaptai dam and Hydra-Electricity", *The Bangladesh Observer*, (Dhaka, May 27, 1974)

Dhaka University Institutional Repository



বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২ হাজার ১৯০ মেট্রিক টন কাগজ এবং এর বাজার মূল্য আনুমানিক ১২৫ কোটি টাকা। অথচ চন্দ্রঘোনা পেপার মিল কমপ্লেক্স সহ জেলার অন্যান্য বৃহৎ কলকারখানার চাকরী থেকে পাহাড়ীরা প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে ঃ

*"workers presently employed in the different projects of the district are mostly import from outside the district. It is interesting to note that at one stage of its normal operation the Karnafully Paper Mill employed only 14 hillmen out of the labour force of 3290 persons. The picture is almost the same in all the project in CHTs."* এভাবে দেখা যাচ্ছে নিজ এলাকার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর ক্রমশ তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে যাচ্ছে এবং এ জেলার অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি চলে গেছে বহিরাগত বাঙালীদের উপর।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পি. বি. চাকমা তাঁর *'Chittagong Hill Tracts and its Development'* নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

*"In other sectors of the economy also, the domination of the Bengali migrant is clearly evident. The construction of Kaptai dam opened many avenues for an earning which were properly utilized by them. For long trade and commerce was and is still in the hands of Bengalis Market are monopolized by traders coming from plains. It is a rare case in Chittagong Hill Tracts to find a tribesman owing a shop at the market place. The only market performance of the Tribal People is selling agricultural and forest product to unscrupulous Benglia traders at a minimum price, who, in turn, sell them at an exorbitant price to others at the same spot. Like trade, factories are also managed predominantly by the Bengali People."* [২৫]

৭.৩ বহিরাগত বাঙালী পুনর্বাসন :

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট সংকট, দুর্দশা ও সমস্যার পাশাপাশি সরকারী নীতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ এই অসন্তোষের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। পার্বত্য

---

২৫. প্রদীপ্ত ঈসা, *op. cit.*, p. 30.

Dhaka University Institutional Repository



চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এই নতুন বসতি স্থাপনকারীরা আজ অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

১৯০০ সালের রেগুলেশন বলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন অ-উপজাতীয়কে জমি খরিদ করার সুযোগ দেয়া হয়নি। তবে কর্ণফুলী উপত্যকায় লাঙ্গল চাষের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় তৎকালীন চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁ চট্টগ্রাম থেকে কতিপয় বাঙালী মুসলমান পরিবারকে রাঙামাটির সন্নিকটে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। এসব বাঙালী মুসলমানেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বাঙালী হিসেবে পরিচিত এবং পাহাড়ীদের সাথে এদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। এভাবে সে সময় কৃষি কাজের সহযোগীতার জন্য আনীত বাঙালী পরিবারদের রাজার অনুমতিক্রমে স্থায়ী বাসিন্দা করা হয়। অবশ্য তখন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতজনিত কারণে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ ও অপ্রীতিকর সম্পর্ক ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের কার্যকারীতাকে অমান্য করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৫১-৫২ সালে। তখন সরকারী উদ্যোগে রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চর ও লংগুদু থানায় এবং বান্দরবান জেলায় লামা ও নাক্ষাংছড়ি থানায় ভারত থেকে আগত বাঙালী শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হয়। ১৯৬৬ সালে আইউব আমলে মোহাজের অবাঙালীদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। সমস্যার সূত্রপাত এখান থেকেই। আস্তে আস্তে বাঙালী পুনর্বাসিতদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে তাদের মধ্যে অধিকার চেতনা এবং জবরদখল করার মনোভাব ততই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাহাড়ীদের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা পুরানো সমস্যা। তাদের জমি জমার রেকর্ডপত্র, জমির মাপজোখ নেই বললেই চলে। এসবের কারণে অ-উপজাতীয়রা পাহাড়ীদের সরলতার সুযোগে তাদের জমিজমা জোর জবরদস্তি দখল করে নিতে থাকে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য জেলার লোক অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে এবং তিনি দখলকৃত জমি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঐ নির্দেশ বাস্তবে কার্যকর হয়নি।[২৬] বাংলাদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় প্রত্যেক সরকারের সময়ই পাহাড়ে বাঙালীদেরকে কমবেশী পুনর্বাসন করা হয়েছে। তবে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এর পর জিয়া সরকারের আমলেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বেশী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে জিয়া সরকারই সবচেয়ে বেশী বাঙালীদের পুনর্বাসন করে পাহাড়ী বাঙালীদের মধ্যে অসন্তোষ, হানাহানি এবং বিরোধের সূত্রপাত ঘটান। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে

২৬. সাপ্তাহিক *একতা*, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা পর্যালোচনা-৩", (ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৮)

Dhaka University Institutional Repository



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এর উপস্থিতিতে ৩০ হাজার বাঙালী পরিবারকে ঐ বৎসরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্ধের কথা বলা হলেও ঐ তহবিলের উৎস অনুল্লেখ রাখা হয়।

১৯৮০ সালের জুলাই মাসে USAID এর তথ্য অনুসারে পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১ লক্ষ বাঙালীকে পরিবার প্রতি ৫ একর জমি ও নগদ ৩,৬০০ টাকা বরাদ্ধ দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[২৭] এই পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গ্রামসরকার বরাবরে প্রয়োজনীয় লোক সরবরাহের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে তার নমুনা দেখানো হল :[২৮]

---

২৭. The Chittagong Hill Tracts Militarization, Oppression and the Hill Tribes Anti slavery. pp 23-24.

২৮. বিপ্লব চাকমা, *op. cit.*, pp. 91

*Dhaka University Institutional Repository*



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনার-এর দপ্তর
চট্টগ্রাম বিভাগ
চট্টগ্রাম

প্রতিঃ জনাবঃ .....
গ্রাম সরকার প্রধান
.....
.....
.....

পার্বত্য চট্টগ্রাম এক বিশাল এলাকা বেষ্টিত জিলা। এখানে লোকবসতি খুবই কম। এই জিলায় লাখ লাখ একর সরকারী খাস জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। যাহা উৎপাদনমূলক কোন কাজেই ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা এক জাতীয় অপচয়। বাংলাদেশ সরকার ইহাকে উৎপাদনশীল করার অভিপ্রায়ে দেশের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককূলের মাঝে বিনা মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। উৎসাহী কৃষক যাহারা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চান তাহাদিগকে নিম্ন বর্ণিত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবেঃ

ক) ৫ (পাঁচ) একর পাহাড়ী জমি প্রতিটি উৎসাহী কৃষক পরিবারকে বিনা মূল্যে সাব কবলা করিয়া দেওয়া হইবে।

খ) বসতি স্থাপনের জন্য ঘর বাড়ী তৈয়ার করা এবং অন্যান্য প্রাথমিক খরচ মিটানোর জন্য প্রতি পরিবারকে বিভিন্ন কিস্তিতে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র নগদ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

গ) প্রতি পরিবারকে প্রথম ৬ (ছয়) মাস বিনা মূল্যে প্রতি সপ্তাহে ২১ (একুশ) সের গম বা ধান দেওয়া হইবে।

ইহা ছাড়াও সরকারী খরচে পরিবারের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল ও মাদ্রাসা ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উল্লেখিত ব্যবস্থাধীনে এই পর্যন্ত প্রায় ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ পরিবারই ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

সরকারীভাবে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই আপনার এলাকার লোকজনের মনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে আগ্রহ সৃষ্টি করিবে। আমার মনে হয় আপনার গ্রামে এমন অনেক ভূমিহীন গরীব পরিবার আছে যাহাদের সচ্ছল জীবন যাপন করিবার কোন উপায় নাই। তাঁহাদের এই অভাব দূর করিয়া জীবনে সচ্ছলতা আনার জন্য আপনি তাহাদিগকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন।

নিজ জীবনের উন্নতি তথা দেশের সার্বিক গঠনমূলক কর্তব্য কর্মে আগ্রহী এমন সব পরিবারকে যতটুকু সম্ভব একত্রিত করিয়া আপনি প্রত্যেককে একটি করিয়া পরিচয় পত্র (সার্টিফিকেট) প্রদান পূর্বক হাজী ক্যাম্প, পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে পাঠাইলে আমি সুখী হইব।

আপনার পাঠানো লোকজন পরিবারসহ হাজী ক্যাম্পে উপস্থিত হইলে সরকারী ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠাইয়া বসতি স্থাপন করান হইবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবে আপনার মতামত আগামী ..... তারিখের মধ্যে জানাইলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।

বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository



বাঙালী পুনর্বাসনের ব্যাপারে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু সরকার সেসব প্রতিবাদ এবং আপত্তিকে গ্রাহ্য করেননি। এভাবেই সরকার এবং উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেমন একদিকে মন কষাকষির সৃষ্টি হয় তেমনি পুনর্বাসিত বাঙালী এবং স্থানীয় উপজাতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয় জমি সংক্রান্ত বিরোধ। উপজাতীয়রা প্রায় ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত ছাড়া জমি আবাদ এবং ভোগ দখল করত কারণ তারা জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারী নিয়ম কানুন তেমন জানত না। এছাড়া বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমির পার্শ্ববর্তী খাস জমিও কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ভোগ দখল করত। সরকারীভাবে বাঙালী পুনর্বাসিতদের পাহাড়ী জমিই বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন পুনর্বাসিত বাঙালী নিজ বন্দোবস্ত পাহাড়ী জমি সংলগ্ন উপজাতীয়দের বন্দোবস্ত অথবা খাস দখলীয় জমি বিভিন্ন উপায়ে জোর পূর্বক দখল করে নেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কম থাকা সত্ত্বেও সরকার ভূমিহীন বাঙালী পরিবারগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের ফলে সাফল্য লাভ করে। এসব পুনর্বাসন কাজে সেনাবাহিনীকে একটি বড় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। নতুন বসতি স্থাপনকারীরা জোর করে পাহাড়ীদের ধান কেঁটে নিত, ফসলের গাছ নষ্ট করত, জোরপূর্বক হালের গরু কেড়ে নেয়ার মত কাজ করলেও পাহাড়ীরা এসবের কোন প্রতিকার পায়নি। বরং সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের নানা অত্যাচারের কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। ১৯৯১ সালের মে মাসে *The Chittagong Hill Tracts Commission* এর ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়, *"Attacks on hill People's villages are the most common way to evict the inhabitants from their lands. A Tripura refugee in India from Bakmara Taindong Para near Matiranga described what happened to his village in 1981 when the settlers moved into his village:*

*"Muslims from different parts of Bangladesh were brought in by Bangladeshi authorities. Before that our village was populated only by chakma, Tripura and Marma. With the assistance of the government these settlers here rehabilitated in our village and they continued to give us various troubles ..... they indicates persons and the Army beats them and robs. They took all the food grain. Whenever we seek any justice from the Army we don't get it. All villagers lived under great tension due to various incidents all around. Three days after an incident when six person had been killed just before getting dark. Many*

Dhaka University Institutional Repository



*settlers come to our village. Shouting "Allahu Akbar". When they arrived we escaped so the settlers got the opportunity to set fire."* [২৯]

পুনর্বাসিত বাঙালীদের এতদঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর হাল, কৃষি, চাষ, শিল্পকারখানার চাকুরী, কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য শিকার, দিন মজুরী এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার সাথে তারা ব্যাপকভাবে জড়িত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে উপজাতীয়দের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার ছাপ দিতে পেরেছে। পরিস্থিতিগত প্রতিকূলতা এবং পেশাগত দক্ষতার অভাবই উপজাতীয় জনসাধারণের কর্মহীনতার প্রধান কারণ। সম্প্রতি চাকমা ও মারমা সম্প্রদায়ের কিছু লোকজন শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করে চাকুরী ও ব্যবসায় নিয়োজিত থাকলেও সাধারণ উপজাতিরা সেই প্রান্তিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। এসব কারণে দেখা যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি মূলতঃ বাঙালীদেরই নিয়ন্ত্রণে। উপজাতীয়দের অধিকার যখন সরকার, সেনাবাহিনী এবং নতুন বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা ক্রমাগত ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে তখন শান্তিবাহিনী তার এ্যাকশন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংঘাতময় পরিবেশের সৃষ্টি করে তোলে। প্রথমদিকে কর্মসূচী ছিল থানা, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীতে ব্রীজ, কালভার্ট, সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করা এবং সুযোগ মত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ করা।[৩০] ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অত্যন্ত সংঘাতময় ছিল। এই সময়ে শান্তিবাহিনী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিম্নে দু'টি সারণির মাধ্যমে এই সংঘর্ষের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হোল :

---

২৯. Life is not ours- Chittagong Hill Tracts Commission, May, 1991, pp. 65-66.

৩০. সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*, (ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮)

*Dhaka University Institutional Repository*



সারণি-১ : শান্তিবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান (১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯১ সালের আগষ্ট পর্যন্ত)[৩১]

| সনদ | নিহত | | আহত | | অপহরণ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাঙালী | উপজাতীয় | বাঙালী | উপজাতীয় | বাঙালী | উপজাতীয় |
| ১৯৮০ | ৮৭ | ৮ | ৭৫ | ৫ | ৫৭ | ৭ |
| ১৯৮১ | ৪২ | ২ | ২৮ | ২ | ৩ | ১২ |
| ১৯৮২ | ১৬ | ৭ | ২০ | -- | ৫১ | ১৮ |
| ১৯৮৩ | ৮ | -- | ৮ | ৩ | ১৫ | ১ |
| ১৯৮৪ | ১০৮ | ৭ | ৪৫ | ৮ | ১৮ | ২৭ |
| ১৯৮৫ | ১১ | ১৪ | ১৯ | ৮ | ২৫ | ১৯ |
| ১৯৮৬ | ২৪৮ | ৩৩ | ১১৮ | ১৬ | ৩৩ | ৪ |
| ১৯৮৭ | ১১৭ | ১৯ | ৬৭ | ৯ | ১৭ | ৮ |
| ১৯৮৮ | ১২৮ | ১৬ | ৬৫ | ১৪ | ১৩১ | ২৭ |
| ১৯৮৯ | ৭২ | ৪৭ | ১৩৮ | ৫৭ | ২২ | ২৮ |
| ১৯৯০ | ৪৭ | ২০ | ৩৮ | ১২ | ১৮ | ২২ |
| ১৯৯১ | ১২ | ৯ | ৩ | ৮ | ১১ | ৮ |

৩১. সাপ্তাহিক *সুপ্রভা*, (ঢাকা, ৭ই অক্টোবর, ১৯৯১)

*Dhaka University Institutional Repository*



সারণি-২ : নিরাপত্তাবাহিনী ও পুনর্বাসিত অ-উপজাতি কর্তৃক উপজাতি হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান[৩২]

| গণহত্যা/দাঙ্গা | নিহত | আহত | ধর্ষণ/ নিখোঁজ | আটক/ নির্যাতন | অগ্নিসংযোগ (ঘরবাড়ী/ গ্রাম) | শরণার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. পানছড়ি, দীঘিনালা, বড় মেরুং (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) | ১০ | ১ | .... | .... | .... | .... |
| ২. বোয়ালখালী বাজার (দীঘিনালা) (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) | ৫৮ | .... | .... | .... | .... | .... |
| ৩. কুকিছড়া (খাগড়াছড়ি) (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ | ২২ | .... | .... | .... | ২০০ | .... |
| ৪. পানছড়ি (কালানাল) (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১) | ৪৭ | ৪ | .... | .... | .... | .... |
| ৫. গরগজ্যাছড়ি (খাগড়াছড়ি) | ৩ | .... | .... | .... | .... | .... |
| ৬. কমলাপতি (কাউখালী) (২৫শে মার্চ, ১৯৮০) | ২১৪ | ১৫০ প্রায় | ৩৬ (ধর্ষণ) | .... | ৯ টি গ্রাম | .... |
| ৭. মাটিরাঙ্গা (বেলছড়ি) (২৫শে জুন, ১৯৮১) | ৩০০ (প্রায়) | ২০৯ | .... | .... | ৫০০৭ (৩৫টি গ্রাম) | ২০,১২৮ (ত্রিপুরা রাজ্য) |
| ৮. ভূষণছড়া, হরিণা (৩১শে মে-৭ই জুন, ১৯৮৪) | ৬২ | ২ | নিখোঁজ ৫ (ধর্ষণ১৪) | .... | .... | ১২,০০০ (মিজোরাম) |
| ৯. পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি (১লা মে, ১৯৮৬) | ৫০ | ৫ | ৮৬ নিখোঁজ | .... | .... | ১০,০৯২ (ত্রিপুরা রাজ্য) |
| ১০. রামবাবু ঢেবা, মাটিরাঙ্গা (১৮ই মে, ১৯৮৬) | ৪২ | ৮ | .... | .... | .... | ৯,০০০ ত্রিপুরা রাজ্য) |
| ১১. চংড়াছড়ি, মেরুং (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬) | ১৮ | ১৬ | .... | .... | .... | ১০,০০০ (ত্রিপুরা রাজ্য) |
| ১২. হীরাচর, সার্বোতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালী (৮,৯ ও ১০ই আগষ্ট, ১৯৮৮) | ৪৬ | ২১ | নিখোজ ২৬ (ধর্ষণ ৪) | .... | .... | .... |
| ১৩. লংগদু (৪ঠা মে. ১৯৮৯) | ৩২ | ১১ | .... | .... | .... | .... |
| ১৪. মাহিল্যা, লংগদু (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২) | ১৪ | ১৮ | .... | .... | .... | .... |
| ১৫. লোগাং, পানছড়ি (১০ই এপ্রিল, ১৯৯২) | ১৩৭ | ৪৮ | অসংখ্য | .... | ৫০০ | ১,৫০০ (ত্রিপুরা রাজ্য) |

৩২. [তথ্য সূত্রঃ তাপস, ত্রিপুরা, 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো', নানিয়ারচর গণহত্যা স্মরণিকা 'চিৎকার', পৃ. ১৫-১৬, নভেম্বর, ১৯৯৪ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তথ্য অবলম্বনে সঙ্কলিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘটিত আটক, নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, কিংবা পত্রিকায় অপ্রকাশিত তথ্য অবশ্য এ পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত নয়।]

Dhaka University Institutional Repository



১৯৮০ সালের ২৫শে মার্চে কাউখালী বাজারে সংঘটিত ভয়াবহ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর দেশের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং তিন জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের দ্বারা একটি তদন্তকারী কমিটি গঠিত হয়। যার সদস্য ছিলেন যথাক্রমে- রাশেদ খান মেনন, শাহ্জাহান সিরাজ ও উপেন্দ্র লাল চাকমা। উক্ত কমিটি সরকারের কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেছিল ঃ

(১) বেসামরিক প্রশাসনের স্বার্থে সামরিক বাহিনীর অপারেশন বন্ধ করা।

(২) উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অবিলম্বে আলোচনা করা এবং কমলাপতি সহ অন্যান্য ঘটনার তদন্ত, বিচার ও শ্বেতপত্র প্রকাশ।

(৩) বিভিন্ন জেলা থেকে এ জেলায় শরণার্থীদের পুনর্বাসন বন্ধ করা।

(৪) শরণার্থীদের অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে নেয়া।

(৫) নির্যাতিত ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও বিধ্বস্ত বৌদ্ধ মন্দির পুনর্গঠন করা। এবং

(৬) বাজারে বেচা কেনার উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা।

কিন্তু তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকার এসব প্রস্তাব অনুযায়ী কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি বরং জিয়া সরকার মুজিব আমলে স্থাপিত তিন মহকুমার তিনটি সেনানিবাসকে অত্যাধুনিকভাবে সম্প্রসারিত করে এবং পূর্ণ সামরিক শক্তি দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী সফলতা অর্জন করতে পারলেও সর্বক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।[৩৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙালীদের পুনর্বাসন নিঃসন্দেহে পাহাড়ী-বাঙালীর ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য ছিল হুমকি স্বরূপ। নতুন বসতি স্থাপনকারীদেরকে যেমন উপজাতীয়রা স্বাভাবিক ভাবে বরণ করে কিংবা অধিকাংশে আপন করে নিতে পারেনি ঠিক তেমনি বাঙালীরাও সহজেই উপজাতীয়দের জীবনধারার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি। ফলে সর্বদাই হিংসা, বিবাদ আর পরস্পরকে শত্রু মনে করা স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে সংহতির প্রকট সংকট দেখা দেয়। অবশ্য ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির কতিপয় ধারা নতুন করে বহিরাগত বাঙালী পুনর্বাসনের পথকে রুদ্ধ করে উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও ঐতিহ্যকে রক্ষণ করার পথকে সুপ্রশস্থ করেছে।

---

৩৩. ফেরদৌস হোসেন, *op. cit.*, pp. 111

Dhaka University Institutional Repository



**৭.৪ ভূমির অধিকার বিষয়ক সমস্যা :**

কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে সামগ্রিক ভাবে ভূমি অধিকার সম্পর্কে পার্বত্যবাসী সন্দিহান হয়ে ওঠে। বাঁধ নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের একদিকে যেমন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। তৎকালীন কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ অঞ্চলের মাটি ও ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে একটি ব্যাপক জরিপ কাজ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে কলম্বো পরিকল্পনার অধীনে কানাডীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে কানাডীয় কোম্পানী *Forestal Forestry And Engineering International Limited* কে নিযুক্ত করে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জরীপ চালিয়ে উক্ত কোম্পানী ১৯৬৬ সালের মে মাসে *"Soil And Land use Survey, Chittagong Hill Tracts"* নামে মোট নয় খণ্ডে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে।[৩৪] *Forestal* এর প্রতিবেদনের দ্বিতীয় খন্ডে *Geomorphology and Geology* শিরোনামের Soils and Capability উপ-শিরোনাম অংশে মাটির আকৃতি, ব্যবহারের উপযোগীতা, উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিকে মোট ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ভূমির ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা A থেকে D পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যায়।

'A' শ্রেণীর জমি ঃ এই শ্রেণীর জমি বিভিন্ন শ্রেণীর ফসল উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য এবং এর ক্ষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। মাটির গভীরতা বেশী ব্যবহার সহজ এবং পানিধারণ ক্ষমতা ভাল বলে ধান এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনে এ মাটির ব্যবহার এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ১,০৪,৩০৪'৬৪ একর।

'B' শ্রেণীর জমিঃ এই জমির কিছু অংশ সমতল করে নিয়ে চাষ করা যায় বাকী জমি কেবল ফল ও সব্জী চাষের উপযোগী। ভূমির ব্যবহারের বাঁধাসমূহ হল শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত ঢালুত্ব এবং ভূমির ক্ষয় প্রবণতা। ভূমির অবস্থার অবনতি রোধ করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ শ্রেণীর মোট জমির পরিমাণ ৯৪,৫২৬'৬৪ একর।

---

৩৪. সলিল রায়, "পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান", *বিজু সংকলন*, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository



'C' শ্রেণীর জমিঃ এই শ্রেণীর ভূমির বৈশিষ্ট্য হল শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ঢালুত্ব, উচ্চহারে ভূমি ক্ষয় প্রবণতা, নিম্নমানের আদ্রতা ধারণ ক্ষমতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছ পালার শিকড় স্থাপন, এলাকার অগভীরতা, এই শ্রেণীর ভূমি ব্যবহারে কঠোর সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এর বহুলাংশ ফল, সব্জী চাষ ও কিছু অংশ বনায়নের উপযোগী। এ শ্রেণীর জমির পরিমাণ ৫,০৫,২২৫·৬০ একর।

'C-D' শ্রেণীর জমিঃ এই শ্রেণীর জমির পরিমাণ ৪৫,৬৬৩·২৮ একর। C-D শ্রেণীর জমিতে C এবং D শ্রেণী এলাকা অতি ক্ষুদ্র ইউনিটে বিদ্যমান থাকায় এই দুই শ্রেণীর ভূমিকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো সম্ভব নয়। বনায়নের জন্য এই শ্রেণীর ভূমি উপযোগী। কিন্তু সমতল করার পর ফল ও সব্জী চাষের উপযোগী।

'D' শ্রেণীর জমিঃ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই জমি ব্যবহারের প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলি হল ভূমির চরম খাড়া অবস্থান, অধিক ক্ষয় প্রবণতা, নিম্নমাত্রার আদ্রতা ধারণ ক্ষমতা এবং কোনো কোনো এলাকায় মাটির স্বল্প গভীরতা। এ শ্রেণীর ভূমির ব্যবহার এত বেশী সীমাবদ্ধ যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসল নির্বাচনের সুযোগ নেই বললেই চলে। এই শ্রেণীর জমির পরিমাণ ২৫,০৯,৮৩০·৪০ একর যা কেবলমাত্র বনায়নের জন্য উপযোগী।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে সমগ্র জেলার উৎকৃষ্ট ধান্য জমির বা 'A' শ্রেণীর জমির ৫২% ভাগ অর্থাৎ ৫৪,০০০ একর জমি জলমগ্ন হয়। যদিও সরকারীভাবে ৪০% বলা হয়ে থাকে। ফলে ধান্য জমির পরিমাণ কমে আসে। অন্যদিকে জলে ভাসা জমি বা *Fringe Land* এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এ জমিতে চাষাবাদের জন্য হ্রদের পানির উঠানামার উপর নির্ভর করতে হয় বলে এ সমস্ত জমি চাষাবাদে কেউ উৎসাহিত হয় না। তাছাড়া ষাট দশকে তৎকালীন সরকার উদ্যান প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতীয়দের ফল চাষে উৎসাহিত করে তুললেও পরবর্তীকালে বাজারজাতকরণ সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস ইত্যাদি কারণে লাভজনক না হওয়ায় তারা উদ্যান প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী পুনর্বাসনের ফলে উপজাতীয়দের ভূমির অধিকার, জুম চাষ, বনবিভাগের বহির্ভূত বনভূমি সমূহের উপর সামগ্রিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। সেখানে পার্বত্যবাসীর ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে বনভূমি উজার হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে রয়েছে উপজাতি ও অ-উপজাতীয়দের জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ।

স্বাধীনতার পর ভূমি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১২.৬%। ১৯৩১ সালে হয় ১২.৯%, ১৯৪১ সালে ১৬%, ১৯৫১ সালে ১৬.৩% ও ১৯৬১ সালে ৩৪%। কিন্তু ১৯৮১ সালে তা বেড়ে হয় ৪৬.৮%। অথচ ঐ সময় সমগ্র বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository



হার ছিল ১১.৭৯%। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যাপক হারে পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অভিবাসন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান হওয়ার প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি ও অ-উপজাতীয় জনসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৯৭.৫% এবং ২.৫%, ১৯৫১ সালে অনুপাত ছিল ৯১ ঃ ৯ এবং ১৯৬১ সালে ছিল ৮৮ ঃ ১২। কিন্তু ১৯৮১ সালে তা বেড়ে ৫৯ ঃ ৪১ তে দাঁড়ায়। জনসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই রামগড় থানার ফেনী উপত্যকায় উর্বর জমিতে অ-উপজাতীয়রা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ম্যানুয়েলকে অগ্রাহ্য করে জমি ক্রয় ও বন্দোবস্তীর ব্যাপারে বহিরাগত অ-উপজাতীয়দের সুযোগ সুবিধা বেশী দেয়ায় সরকারের কুটকৌশল উপজাতীয়দের তুলনায় ক্রমশঃ অউপজাতীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে থাকে।

ভূমির সমস্যা খুব জটিল এবং এটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান।[৩৫] ভূমি সংক্রান্ত আধুনিক নগর জীবনের আইন কানুনের সুব্যবস্থা এখানে না থাকলেও পূর্বে জমি নিয়ে তেমন বিরোধ বা প্রকট সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সরকারগুলো যখনই রাজনৈতিক কুটকৌশলের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের দমন করতে চেয়েছেন তখন থেকেই এ সুপ্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে বাংলাদেশে জাতিগঠন প্রক্রিয়া আরো একবার মুখ থুবরে পড়ে যায়।

বাংলাদেশের আয়তন দশ ভাগের একভাগ ভূমি নিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম। মোঘল শাসনের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির অধিকার ছিল প্রথা ও রীতিনীতির উপর। ব্রিটিশ সরকার মূলতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিদ্যমান প্রথা ও রীতিনীতি সমূহে হস্তক্ষেপ না করেই ভূমির মালিকানা নিয়ে উপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। ১৯০০ সালের রেগুলেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের কিছু অধিকার স্বীকৃত হলেও, ভূমি প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের হাতে ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে পার্বত্য রাজাগণ শুধুমাত্র নরপতি, ভূপতি নয়।

বিদ্যমান ম্যানুয়েলের ৩৮ বিধি অনুসারে উপজাতীয়দেরকে জমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ডেপুটি কমিশনারকে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের রাজার পরামর্শ নেয়ার জন্য বলা হলেও তা রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষিত হয়। জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যাপারে ডেপুটি কমিশনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি স্থানীয় হেডম্যান এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে হেডম্যানদের প্রতিবেদন ব্যতীত জমি বন্দোবস্তী দেয়ার কথা না থাকলেও বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম লংঘন করা হচ্ছে। তাছাড়া বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলকৃত এবং আবাদকৃত জমি অনেক বহিরাগত বাঙালীদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

---

৩৫. দৈনিক *সংবাদ*, (ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



এসব ক্ষেত্রে প্রতিকার চেয়েও কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংঘর্ষের কারণে অনেক উপজাতি তাদের ধানী জমি, ফলবাগান ও বনবাগান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার কারণে তা অ-উপজাতীয় নতুন বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জমি বন্দোবস্ত নেয়ার প্রতি উপজাতিদের কোন আগ্রহ ইতিপূর্বে ছিলনা। দখলিস্বত্বের একমাত্র দলিল যে জমাবন্দি অফিসে ছিল তা ১৯৯৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের অফিস অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উপজাতীয়দের জমির আর কোন দলিল নেই। উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক জীবনে ভূমি সংক্রান্ত এমনতর জটিল সংকট তাদেরকে বসবাসের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুসারে সংশ্লিষ্ট কমিশনার জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা হলেও স্থানীয় সরকার পরিষদ জমি বন্দোবস্ত প্রদানের অধিকারী হওয়ার ফলে জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন বিরাজ করে। অভিজ্ঞ মহলের মতে বাংলাদেশের মতো এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভূমির অধিকার সমূহ সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। গ্রেট বৃটেনের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে ভিন্ন আইন ব্যবস্থা থাকলেও ম্যান (Isle Man) হোয়াইট, (Isle of White) ও জার্সি দ্বীপসমূহে বৃটেনের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নাগরিকদের স্থায়ী বসবাস ও ভূমি মালিকানার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপ ব্যতীত উপজাতিদের ভূমির অধিকারেব সমস্যা সমাধান করা দুরূহ।

**স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিতে ভূমি বিষয়ক সুযোগ সুবিধা**

গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে শান্তিচুক্তি[৩৬] স্বাক্ষরিত হয় তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের ভূমি সংক্রান্ত বিরাজমান সমস্যার সমাধান কল্পে কতিপয় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা গেল।

চুক্তির 'ঘ' খন্ডে ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে জায়গা জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিগুলো ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠিত হবে। এ খন্ডে ৬ ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী এ কমিশন প্রচলিত ভূমি আইনের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করবে। এ খন্ডে ২ ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার এ চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের কাজ শুরু করবে এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করত। উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভূক্তকরণ ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবে। চুক্তির 'খ' খণ্ডে ২৬ ধারার 'ক' উপধারা অনুযায়ী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত

---

৩৬. ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে সাক্ষরিত শান্তিচুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি ইজারা প্রদান সহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। 'খ' উপধারা অনুযায়ী পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ইহার সম্মতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ (হুকুম দখল) ও হস্তান্তর করা যাবে না। 'গ' উপধারা অনুযায়ী পরিষদ সহকারী কমিশনার (ভূমি) সহ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার ও কানুনগোদের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

চুক্তির এ ধারাগুলো কার্যকর হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার অধিকাংশই সমাধান হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। ফলে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সৃষ্ট জাতিগঠনের সংকট ও সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে সংশয় অউপজাতীয়দের নিয়ে সে দিকে সুদৃষ্টি না দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অচিরেই অ-উপজাতীয়দের বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে, অ-উপজাতীয়দের অধিকার নিশ্চিত না রেখে উপজাতীয়দের সার্বিক মঙ্গল সেখানে বৈষম্য এবং ক্ষোভের যে সঞ্চার করবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই দেশ ও জাতিগঠন কার্যক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকার ও বন্টনে যুক্তিসঙ্গত ভারসাম্য একান্ত অপরিহার্য।

**৭.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দুর্বলতা :**

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর এ লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ২০ শে অক্টোবর ৭৭ নং অধ্যাদেশ বলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। বোর্ডের গঠন প্রণালীতে[৩৭] নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে।

ক) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হবেন।

গ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সার্বক্ষণিক এবং একজন খণ্ডকালীন সদস্য থাকবেন।

ঘ) সরকার সার্বক্ষণিক সদস্যের মধ্য থেকে একজনকে বোর্ডের সচিব নিয়োগ করবেন।

ঙ) চেয়ারম্যানই বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

অবশ্য এর পরে সরকার তার নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' অধ্যাদেশ সংশোধন করে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জি.ও.সি. ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক অধিনায়ককে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বিভাগের একজন অতিরিক্ত কমিশনার কে বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। সিভিল প্রশাসনে এভাবেই মিলিটারী প্রশাসনের কর্তৃত্ব প্রদান করে এ অঞ্চলে ব্যয়বহুল সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই খরচ

---

৩৭. Life is not ours- Chittagong Hill Tracts Commission, May, 1991. P. 84.

Dhaka University Institutional Repository



বা ব্যয়ের কোন সঠিক হিসেব জাতীয় সংসদে প্রদান করা হয়নি। বাঙালী জনগণের করের অর্থ এ ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্নখাতে ব্যয় করা হয়।

তিন সার্কেলে প্রধান ও কিছু স্থানীয় নেতাদের নিয়ে বোর্ডের কন্সালটেটিভ কমিটি গঠন করা হলেও বোর্ডের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মূলত তাঁদের কোন ভূমিকা নেই। চেয়ারম্যানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সহায়তায় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী বোর্ডের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। আমলা নির্ভর হওয়ার কারণে এই বোর্ডে উপজাতীয়দের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। The Chittagong Hill Tracts Commission- May 1991 এর প্রতিবেদনে ৮৪ পৃষ্ঠার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

"The CHTDB was established in 1976 by the late Ziaur Rahman to fight the Shanti Bahini. It is a purely political organization to bribe the tribales. Loans are given for private purpose, to businessman and tribal leaders ..... They are show pieces of the government. Yes it is mostly a political bribe to tribal leaders to buy them off so they would not help the **Shanti Bahini**". [৩৮]

পার্বত্য অঞ্চলে সড়ক উন্নয়ন, ইমারত নির্মাণ সহ অন্যান্য ছোট খাট প্রকল্প সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়ন করা হলেও বোর্ড উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপজাতিদের সম্পৃক্ত না করায় উপজাতিদের মনে ক্ষোভ থেকে যায়। তাছাড়া বোর্ড রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির ফল হওয়ায় এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি যাতে পাহাড়ীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। আনুপাতিক হারে বোর্ডের কার্যক্রমে উন্নয়নের সুফল পাওয়া যায়নি বলে এর পিছনে বিনিয়োগ ও

---

৩৮. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository



উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপজাতিদের সন্দেহ থেকেই গেছে। নিম্নের সারণী থেকে উন্নয়নের নমুনা তুলে ধরা হল।[৩৯]

| সেক্টর | পা.চ.উ. বোর্ড ৯২-৯৩ | পা.চ.উ. প্রকল্প | মোট টাকা | শতকরা ভাগ |
|---|---|---|---|---|
| কৃষিখাত | ৬০,৭৯৪ | ১,১০,৬৯৫ | ১,৭১,৪৮৯ | ১৩ % |
| শিক্ষা | ৫৫,৯৭১ | - | ৫৫,৯৭১ | ৪ % |
| যোগাযোগ/নির্মাণ | ৮৫,৩৩০ | ৫,০২,৩৬৭ | ৫,৫৬,৩৪৫ | ৪২ % |
| খেলাধুলা/সংস্কৃতি | ২৪,৩১১ | - | ২৪,৩১১ | ২ % |
| সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্য | ৬৪,৬১৯ | ৫,৪৪৫ | ৭০,০৬৪ | ৫ % |
| কুটির শিল্প | ৪,৪৯১ | ২৪,২২৫ | ২৮,৭১৬ | ২ % |
| উচ্চভূমি ও পুনর্বাসন | - | ২,৮৪,৬১০ | ২,৮৪,৩১০ | ২১ % |
| বনায়ন ও পুনর্বাসন | - | ৩১,৪৮৭ | ৩১,৪৮৭ | ২ % |
| বোর্ডের উন্নয়ন | ৩৬,১৭০ | ৬৯,০৯৯ | ৭২,৭১৬ | ৬ % |

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থা যুক্তি সংগত বলে বিবেচিত হলেও অনেকের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ক্ষেত্রে ৪২ % ব্যয় হয়েছে মূলত সরকারী যোগাযোগ ও সামরিক বাহিনীর চলাচলের জন্য। অথচ কৃষি খাতে ব্যয় এর পরিমান ১৩ % যা খুবই নগন্য। আসলে সরকারী স্বার্থেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিপুল পরিমান অংকের অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং এর সাথে উপজাতীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করেনি। ফলে উন্নয়ন বোর্ড গঠনে সরকারের উদ্দেশ্য ও ফলপ্রসু হয়নি। আর এ সমস্ত কিছুর প্রভাব পড়েছে জাতিগঠন প্রক্রিয়ায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ট উপজাতীয়দের অংশ গ্রহণ না থাকায় এবং উন্নয়নের ফলাফল সুষম ভাবে বন্টিত না হওয়ায় সৃষ্ট অসন্তোষ বড় আকার ধারণ করে।

**৭.৬ উপজাতীয় শরণার্থী সমস্যা :**

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন কারণ ও আস্থার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহু উপজাতীয় পরিবার ভিটে মাটি ছেড়ে ভারত ও বার্মায় গিয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পুনর্বাসিত বাঙালীদের কারণে উপজাতীয়দের জমি ও সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ায় এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সহযোগীতায় বাঙালীদের সশস্ত্র সংঘাত ও দাঙ্গা

---

৩৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিবেদন (১৯৯২-১৯৯৩)

Dhaka University Institutional Repository



সৃষ্টির কারণেই সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতি ভিন দেশে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে নতুন কার্যকর জীবনে পদার্পণ করে। ১৯৮১ সালের ২৫ শে জুন শান্তিবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে পূর্ব সংঘর্ষের জের হিসেবে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুনর্বাসিত বাঙালীরা যৌথভাবে এগারো মাইল ব্যাপী বিস্তৃত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। এতে আনুমানিক ৩০০-৫০০ জন উপজাতি নিহত এবং ২০৯ জন গুরুতর জখম হয়। তারা ৩৫টি উপজাতীয় গ্রাম পুড়িয়ে দেয়।[৪০] ১৯৮১ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০ হাজার ১২৮ জন উপজাতীয় শরণার্থী (সরকারী হিসেবে ১৭,০২৮) ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[৪১] ১৯৮৪ সালের জুনমাসে ভূষণছড়া ও হরিণায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১২ হাজার উপজাতীয় শরণার্থী ভারতের মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বরে পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, চংড়াছড়িতে (মেরুং) সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গার প্রেক্ষিতে প্রায় ৩০/৪০ হাজার উপজাতীয় নরনারী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয় (ভারতের দাবী অনুযায়ী এ সংখ্যা ৪৯ হাজার এবং বাংলাদেশের দাবী অনুযায়ী এ সংখ্যা ২৯,৯৯২ জন)।[৪২] ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে হীরাচর, সার্বোতলী, খাগড়াছড়ি, পাবলাখালী, লংগদু হত্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে আরও প্রায় ২০/৩০ হাজার উপজাতীয় শরণার্থী ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হলেও যে সময় শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার মধ্যে এসব প্রচেষ্টা সীমিত ছিল।[৪৩] ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন লোগাং গ্রামে এবং ১৯৯৩ সালের ১৭ই নভেম্বর রাঙামাটি জেলায় নানিয়ারচরে এক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে বহু উপজাতি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহিংসতামূলক কার্যকলাপে নিরাপত্তাহীনতার কারণে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন সরকারের সময়ে সমঝোতা ও রাজনৈতিক চাপের কারণে শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে এই পথ ছিল খুবই কন্টকাকীর্ণ।

১৯৯২ সালের ২৬-২৮শে মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরশেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে ত্রিপুরায় অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে দ্রুত প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের বিষয়টি স্থান পায় এবং তাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের সাথে প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্যের পরিপ্রেক্ষিতে

---

৪০. প্রদীপ্ত খীসা, *op. cit.*, pp. 61

৪১. *Ibid.*

৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা, ১৬ই মে, ১৯৮৭)

৪৩. *দৈনিক সংবাদ*, (ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যার নিরসনকল্পে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য সরকার ৯-৭-১৯৯২ সালে তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী জনাব অলি আহমদকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করেন।

জনাব অলি আহমদের নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশী প্রতিনিধিদল ১৯৯৩ সালের ৮, ৯ ও ১০ মে ত্রিপুরাজ্য সফর করেন। দলের অন্যান্য সদস্য ছিলেন রাশেদ খান মেনন, কল্পরঞ্জন চাকমা এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব। প্রতিনিধি দলটি শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। সফরশেষে একটি যৌথ ঘোষণা প্রকাশিত হয়। উক্ত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরের দিন অর্থাৎ ১০ই মে হতে ৩০ দিনের মধ্যে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। প্রত্যাগত শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি, মনিটরিং কমিটি ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়সূচী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার এবং প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাদি দেখার উদ্দেশ্যে ১লা জুন রামগড় সফররত শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ৮ই জুন রামগড় সীমান্ত দিয়ে ২০০ শরণার্থী দেশে ফিরে আসবেন। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব ঐ দিন প্রত্যাগত শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর জন্য সারাদিন রামগড়ে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু ঐদিন অজ্ঞাত কারণে শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসেননি।

১৯৯৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী হতে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাগত শরণার্থীদের ১৬ দফা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৮৭১৮ সদস্যবিশিষ্ট ১১৯৯২টি শরণার্থী পরিবারের তালিকা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ৫১৯৬৬ সদস্যবিশিষ্ট ১০৬২৯টি পরিবার সঠিক বলে সনাক্ত করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় সীমান্ত দিয়ে বহু প্রত্যাশিত শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সূচনা হয়। প্রত্যাগত শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর জন্য রামগড় শহর উৎসবমুখর হয়ে উঠে এবং শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এদিন রামগড় শহরে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটে। শরণার্থী প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রামগড় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমে সংক্ষিপ্ত অথচ আড়ম্বরপূর্ণ দু'টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দু'টি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে জনাব অলি আহমদ, রাশেদ খান মেনন, কল্পরঞ্জন চাকমা, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব এবং ভারতের পক্ষ হতে ত্রিপুরার গভর্ণর রমেশ ভান্ডারী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পিএম সাইদ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেববর্মাসহ রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শরণার্থী নেতা উপেন্দ্রলাল চাকমা উভয়

Dhaka University Institutional Repository



অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এ পর্যায়ে ১৫-২-১৯৯৪ ইং তারিখ হতে ২২-২-১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং রামগড় ও তবলছড়ি সীমান্ত দিয়ে ৩৭৯ টি শরণার্থী পরিবারের ১৮৪১ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন। প্রত্যাগত পরিবারের ৩৭৭টি ছিল খাগড়াছড়ি জেলার এবং ২টি পরিবার রাঙ্গামাটি জেলার।[৪৪]

দ্বিতীয় পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম আরম্ভ হয় ২১-৭-৯৪ ইং তারিখ এবং ৫-৮-৯৪ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৪৮ টি শরণার্থী পরিবারের ৩৩৪৫ জন শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৯৪ সালে দু'দফায় আনুষ্ঠানিকভাবে ১০২৭ টি পরিবারের ৫১৮৬ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন।[৪৫]

খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে ভারত সরকারের চাপে এবং বাংলাদেশ সরকার উদ্বাস্তুদের অনেক দাবি মেনে নেয়াতে ১০২৭ পরিবারের ৫১৮৬ জন উদ্বাস্তু বাংলাদেশে ফিরে আসে। কিন্তু অনেকেই তাদের জায়গা-জমি অথবা বসতবাড়ী ফিরে পায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ১১-১২-৯৪ ইং তারিখে প্রত্যাগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে যে, উদ্বাস্তুদের যেসব দাবি পূরণ করবে বলে সরকার ওয়াদা করেছিল, সেসব দাবি অনেকাংশই পূরণ করা হয়নি।

তৃতীয় পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম ৭ই এপ্রিল ১৯৯৭ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং এ সময়ের মধ্যে ১২৪৮টি পরিবারের ৬৭০৩ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন।[৪৬] প্রত্যাগত শরণার্থীদের সরকার ঘোষিত ২০ দফা সুযোগ-সুবিধার আওতায় পুনর্বাসিত করা হয়। শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ই এপ্রিল সংসদ সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমাকে চেয়ারম্যান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে। টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

চতুর্থ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৪০০ পরিবারের ২৩৪৯ জন উপজাতীয় শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছে। এ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় ৩৬৭৫ টি শরণার্থী পরিবারের ১৪২৩৮ জন সদস্য দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত ১৯৯৭ সালের ৩১শে অক্টোবর পেশকৃত তালিকা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের ৬ টি শরণার্থী শিবিরে ৮১৫১টি পরিবারের ৪৪৩৫৯ জন বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থী অবস্থান করছে।[৪৭]

বর্তমান সরকার প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছেন সে অনুসারে একটি শরণার্থী পরিবার দেশের মাটিতে পা রেখেই নগদ নূন্যতম ২১ হাজার টাকা পাবে। কোনো কোনো পরিবার যাদের জমি আছে তাঁরা পরবর্তীকালে আরো অতিরিক্ত ৭ হাজার টাকা পাবে। এছাড়া এক বছরের রেশন সুবিধাসহ

---

৪৪. *Ibid.*
৪৫. *Ibid.*
৪৬. *Ibid.*
৪৭. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository



অন্যান্য সুবিধাতো আছেই। বিগত সরকারও প্রত্যাগত শরণার্থীদের পরিবারপ্রতি নগদ ১০ হাজার টাকা, ৬ মাসের রেশন সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়েছিলেন যা ঐ সময়ের বিবেচনায় বর্তমানের মতই আকর্ষণীয় ছিল। সম্ভবতঃ একারণেই ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হতে তৃতীয় পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কার্যক্রমের সূচনার পূর্ব পর্যন্ত স্বেচ্ছায় ৭৬৮ টি শরণার্থী পরিবারের ২৯৮৮ জন সদস্য দেশে ফিরে এসেছিল।[৪৮] এদেরও একই সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত হয়নি বলে পুনর্বাসন সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় পাহাড়ী শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) কে সম্পৃক্ত করানোর দাবীও উত্থাপন করে। তবে ভারত সরকারের সদিচ্ছা এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সমঝোতায় এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কিছুটা আলোর মুখ দেখে।

উপজাতীয় সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এ সমস্যাটিকে নিদারুণভাবে অবহেলা করেছে বাংলাদেশের সব ক'টি সরকার। আর এর বিরূপ ফল পেয়েছে গোটা দেশবাসী। ঐতিহাসিক ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা হতভাগ্য জাতি। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি পাহাড়ী শরণার্থীদের দেশে ফেরার নিশ্চয়তা দিয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীরা নাগরিকত্ব না পেয়ে সন্ত্রস্তভাবে আসাম ও অরুণাচলে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করেছে। অবশেষে সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শরণার্থী নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে ৩৩ পরিবারের ১৯৯ জন শরণার্থীর সর্বশেষ দলটি বাংলাদেশে আগমন করে[৪৯] এবং এরই সাথে দীর্ঘ দিনের শরণার্থী বিষয়ক সমস্যার কিছুটা সমাধান হলো। তবে যারা শরণার্থী জীবন থেকে নিজ বাসভূমে আবার ফিরে এসেছেন তাদের জীবন যাপনের দিকে জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা স্বদেশেই শরণার্থী হয়ে যাবে।

---

৪৮. *Ibid.*

৪৯. *The Daily Star*, (Dhaka, 28th February, 1998)

Dhaka University Institutional Repository

## অষ্টম অধ্যায়

# ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য শান্তিচুক্তি

### ৮.১ পার্বত্য শান্তিচুক্তির কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক

গত ২ রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.২৪ টায় ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি।[১] চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্য, তিন বাহিনী প্রধান, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সাংসদ, জাতীয় কমিটির সকল সদস্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিনের বৈষম্য, অন্যায়, হানাহানি, ক্ষোভ, সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিরসনে এ চুক্তি শান্তিকামী মানুষের মনে আশার আলো ফুটিয়েছে। সাধুবাদ ও শুভেচ্ছা এসেছে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র থেকে। প্রচলিত সামরিক ধ্যানধারণা অতিক্রম করে রাজনৈতিক সমাধানের তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে একই সময়ে উপনীত হয়ে সরকার সামরিক বাহিনী ও জনসংহতি সমিতি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭ মাসের ক্ষমতার মধ্যে যে চুক্তি করল তা অনেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে চুক্তির[২] প্রধান প্রধান দিক গুলো আলোচনা করা হোল :

চুক্তির মাধ্যমে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন সংশোধন করে তিন পার্বত্য জেলা সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। যার পদমর্যাদা হবে প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান অবশ্যই একজন উপজাতি হবেন। ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে আঞ্চলিক পরিষদ। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। একজন চেয়ারম্যান, ১২ জন উপজাতি (পুরুষ) সদস্য, দু'জন মহিলা উপজাতি, ৬ জন অ-উপজাতি পুরুষ, ১ জন অ-উপজাতি মহিলা সমন্বয়ে গঠিত হবে আঞ্চলিক পরিষদ। পরিষদের ২২ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন চাকমা, তিনজন মারমা, দু'জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তঞ্চঙ্গা, লুসাই, বোম, পাংগো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে একজন সদস্য থাকবে। প্রত্যেক জেলা থেকে দু'জন করে তিন পার্বত্য জেলা থেকে ছয়জন অ-উপজাতি সদস্য থাকবে পরিষদে। উপজাতি মহিলা সদস্যদের মধ্যে একজন চাকমা ও সকল উপজাতি থেকে একজন থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে একজন অ-উপজাতি।

---

১. *The Bangladesh Observer*, (Dhaka, 3rd December, 1997)

২. ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে সাক্ষরিত শান্তিচুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository



আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যরা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন। পরিষদের মেয়াদকাল হবে পাঁচ বছর। আঞ্চলিক পরিষদে যুগ্মসচিব সমতূল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন। একজন উপজাতিকে এই পদে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আঞ্চলিক পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়সাধন করবে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল কর্মকাণ্ডের আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। আঞ্চলিক পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান সমন্বয় করবে। তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণকার্যক্রম পরিচালনা, এনজিও-দের কার্যাবলী সমন্বয় করবে আঞ্চলিক পরিষদ। উপজাতি আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১৯০০ সালের পার্বত্য শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সঙ্গে '৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অসঙ্গতি দেখা দিলে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশে তা দূর করা হবে।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর সমুদয় দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে করবেন।

**পার্বত্য জেলা পরিষদ**

১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভূমি ও ভূমিব্যবস্থা, পুলিশ (স্থানীয়), উপজাতি আইন ও সামাজিক বিচার, যুব কল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, কাপ্তাই হ্রদের জনসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খালবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনী কারবার ও জুম চাষ।

**কর আদায়**

পার্বত্য জেলা পরিষদ যেসব বিষয়ের কর আদায় করবে তা হল : অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর, ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর, গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর,

Dhaka University Institutional Repository



সামাজিক বিচারের ফিস, সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং, বনজ সম্পদের উপর রয়ালটির অংশবিশেষ, সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর, ব্যবসার উপর কর, লটারির উপর কর ও মৎস্য ধরার উপর কর।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক শপথ গ্রহণ করবেন।

মৌজার হেডম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান ও পৌরসভার চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট এবং সার্কেল চিফের সার্টিফিকেট ছাড়া কোন অ-উপজাতি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে 'সার্কেল চিফ' প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করবেন। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন অবশ্যই উপজাতি।

পার্বত্য জেলা পরিষদে উপসচিব সমতূল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন। এপদে উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পার্বত্য জেলা পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ-বদলি ও বরখাস্ত করতে পারবে। এসব নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার থাকবে। অন্যান্য পদে পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শক্রমে নিয়োগ দেবে সরকার। এসব পদে নিয়োগ-বদলি বরখাস্তের দায়িত্বও থাকবে সরকারের।

পার্বত্য জেলা পরিষদ সরকারী অর্থে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবে।

পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তার নিচের সকল পুলিশ নিয়োগ করবে পার্বত্য জেলা পরিষদ। এদের নিয়োগ-বদলির দায়িত্বেও থাকবে পার্বত্য জেলা পরিষদ। নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার থাকবে।

**ভূমির মালিকানা**

আপাতত বলবৎ বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন পার্বত্য জেলা এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে রিজার্ভ বনাঞ্চল, কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

আপাতত বলবৎ অথবা অন্য কোন আইন যাই থাকুক না কেন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ এবং হস্তান্তর করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository



পার্বত্য জেলা পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো, সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

কাপ্তাই হ্রদে জলেভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

আপাতত বলবৎ বা অন্য কোন আইনে যাই থাকুক না কেন জেলা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সরকার পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় সাধন করবে। সরকার পার্বত্য এলাকার ব্যাপারে কোনো গেজেট প্রকাশ করতে চাইলে পরিষদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে করবে।

পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদে কোন আইন পাস হলে তা উপজাতিদের জন্য কষ্টকর হলে পরিষদ লিখিতভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাতে পারবে এবং সরকার তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

**চুক্তির বাস্তবায়ন**

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করবে। কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজনকে আহ্বায়ক করা হবে। তিন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি সদস্য থাকবেন। চুক্তি সই করার তারিখ থেকেই চুক্তি বলবৎ হবে। চুক্তির আওতায় যথাশিগগির সম্ভব সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হবে।

**পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন, ভূমি ও অন্যান্য বিষয়**

ত্রিপুরা থেকে শরণার্থীদের ফেরত ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে জনসংহতি সমিতি সহযোগিতা করবে। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পর সরকার আঞ্চলিক পরিষদের কাছে আলোচনাক্রমে যথাশিগগির সম্ভব ভূমি জরিপের কাজ শুরু করবে। এছাড়া জায়গা-জমির বিরোধ নিষ্পত্তি, উপজাতি জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবে।

সরকার ভূমিহীন বা দু'একরের কম জমির মালিক উপজাতি পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু'একর জমি বন্দোবস্ত দেবে।

জায়গা-জমি বিরোধ নিষ্পত্তি কল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি "ল্যাণ্ড কমিশন" গঠিত হবে। অবৈধভাবে পাহাড়-জমি বন্দোবস্ত, বেদখল প্রভৃতি বাতিলের ক্ষমতা ভূমি কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না। এই কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একজন

Dhaka University Institutional Repository



অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সার্কেল চিফ, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমন্বয়ে গঠিত হবে ভূমি কমিশন। ভূমি কমিশনের মেয়াদকাল হবে তিন বছর। এ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করবে।

যে সকল অ-উপজাতি রাবার চাষের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বরাদ্দ নিয়েছেন অথচ দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি তাদের জমি বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

**শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণ**

চুক্তি সই-এর ৪৫ দিনের মধ্যে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সদস্যদের তালিকা, অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ সরকারের কাছে দাখিল করবে জনসংহতি সমিতি। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের পর অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবে। তালিকানুযায়ী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ও তাদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদান করবে সরকার। নির্ধারিত তারিখে যারা অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেবে তাদের সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে এবং সকল মামলা প্রত্যাহার করবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যকেও সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবে। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের জন্য সরকার এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করবে। হুলিয়া প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করবে সরকার। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সংস্থার ঋণ মওকুফ করবে সরকার। সমিতির সদস্যদের যোগ্যতানুযায়ী চাকুরীতে পুনর্বহাল করবে সরকার।

**নিরাপত্তা বাহিনী**

সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা ব্যতীত সকল সামরিক, পুলিশ, আনসার ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে।

**পার্বত্য বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয়**

উপজাতিদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির প্রধান থাকবেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী। সদস্য থাকবেন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনজন সাংসদ, চাকমা রাজা, বোমাং রাজা, মং রাজা ও তিন জন অ-উপজাতি।

Dhaka University Institutional Repository



## ৮.২ পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও তার প্রতিক্রিয়া

ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি দেশের রাজনৈতিক গতিধারায় বিপরীতধর্মী দু'টি রাজনৈতিক মেরু সৃষ্টি করেছে। একপক্ষ (সরকার এবং তার রাজনৈতিক মিত্ররা) এই চুক্তির সফলতা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন এবং অপর পক্ষ (বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির একটি অংশ এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্ররা) এই চুক্তিকে অসাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার হুমকী স্বরূপ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ফলে শান্তি চুক্তির পরে আবারো এক রাজনৈতিক বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তির কতিপয় অসংগতি সম্পর্কে যে সব যুক্তিতর্ক এবং ভাষ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল:

১। শান্তি চুক্তিতে তিন জেলা প্রশাসকের আদৌ কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব নেই। চুক্তির ৪নং ধারাণুযায়ী (ক অনুচ্ছেদ) প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন 'সার্কেল চীফ'। যিনি একজন উপজাতি। সার্কেল চীফ তাদের কাজের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। বাংলাদেশ সরকারের কাছে দায়ী থাকবেন না। এক্ষেত্রে সমান্তরাল সরকারের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। অনেকটা একই রাষ্ট্রের মাঝে দ্বিতীয় আরেকটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সামিল।

২। চুক্তির 'ক' অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারাণুযায়ী অ-উপজাতীয় এবং স্থায়ী ঠিকানার যে কথা বলা হয়েছে তা বড় ধরণের এক জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ যার বৈধ জমি নেই, স্থায়ী ঠিকানা নেই তিনি এ এলাকার ভোটার হতে পারবেন না এবং প্রকারান্তে এই এলাকা থেকে আইনগতভাবে বিতাড়িত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে কয়েক লাখ পুনর্বাসিত বাঙালী পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করেন। এদের কারো কারো বৈধ জমি থাকলেও চুক্তির সংজ্ঞানুযায়ী স্থায়ী ঠিকানা নেই। কেননা এদের অনেককে গুচ্ছ গ্রামে নিয়ে এদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। চুক্তিতে এদের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ যদি এদের স্ব স্ব জায়গায় থাকার অধিকার না দেন তাহলে এরা পাহাড়ী অঞ্চল ছেড়ে যাবার সম্মুখীন হবেন।

৩। চুক্তিতে জেলা পরিষদ তিনটিকে ব্যাপক ক্ষেত্রে কর আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই করের অংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে কিনা এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল, গ্যাস ও মিনারেলের কর্তৃত্ব কার কাছে থাকবে এর কোন ব্যাখ্যাও নেই। আপাততঃ মনে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব এখানে থাকছে এবং বাংলাদেশ সরকারই তেল, গ্যাস আহরণের ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সাথে চুক্তি করছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আঞ্চলিক পরিষদ এ ব্যাপারে যে তাদের অধিকার দাবী করে বসবেনা তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository



৪। সরকার চুক্তিতে পাহাড়ী এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের কথা বলেছে। কিন্তু চুক্তির 'গ' অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারাণুযায়ী পাহাড়ী এলাকার প্রশাসনিক কাঠামোয় পশ্চাৎপদ রিয়াং, লুসাই, চাক, খিয়াং, উসাই, খুমী, পাংখুজ, বোম, মুরং কিংবা তঞ্চঙ্গা উপজাতির আরো বেশী প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিৎ ছিল। প্রস্তাবিত আঞ্চলিক পরিষদের পুরুষ ১২ জন সদস্যের মধ্যে মুরং ও তঞ্চঙ্গা উপজাতির মধ্যে থেকে নেয়া হবে একজনকে এবং লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং এই ৬টি উপজাতির পক্ষ থেকে নির্বাচিত হবেন একজন। এখানে সম প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়নি। চাকমাদের প্রতিনিধিত্ব ৫ জনে নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ চাকমারা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাত্র ৩০.৫৭ ভাগ। মারমারা মোট জনগোষ্ঠীর ১৬.৬০ ভাগ। আঞ্চলিক পরিষদে তাদের প্রতিনিধি ৩ জন। আর ত্রিপুরারা মোট জনগোষ্ঠীর ৭.৩৯ জন আর তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকছে ২ জন। এখানে বসবাসরত বাঙ্গালীরা মোট জনগোষ্ঠীর ৩৯.৩৮ ভাগ। অথচ পরিষদে তাদের প্রতিনিধি মাত্র ৬ জন পুরুষ। শতকরা ৭২ ভাগ চাকমা শিক্ষিত। এক্ষেত্রে অন্য উপজাতীয়দের শিক্ষার হার অনেকটা এরকম: মারমা - ২০ ভাগ, ত্রিপুরা - ২০ ভাগ, মুরং - ৫ ভাগ, লুসাই - ১৫ ভাগ, বোম - ১৫ ভাগ, চাক - ১৫ ভাগ, খুমী - ৫ ভাগ আর বাঙ্গালী - ২৮ ভাগ। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রস্তাবিত কাঠামোয় চাকমারা উপকৃত হবে বেশী এবং পশ্চাৎপদ অন্যান্য উপজাতীয়রা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

৫। চুক্তিতে সেনা ছাউনি নিয়েও জটিলতা ও বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে আগে বলা হয়েছিল পাহাড়ী এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। এখন দেখা গেল মাত্র ৬টি স্থায়ী ছাউনি (তিনটি জেলা সদরে ও বাকী তিনটি আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালায়) থাকছে। বাকী ছাউনিগুলো প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হলে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় বড় ধরণের নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। ১৯৬০ সালের পর হতে যেসব উপজাতি নর-নারী ভারতে চলে গেছে তাদের ফেরত আনার ব্যাপারে এই প্রস্তাবে কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ষাটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠলে ৪০ হাজার উপজাতীয় ভারতে চলে যায়।[৩] অন্য ২০ হাজার চলে যায় মায়ানমারে। কিন্তু চুক্তিতে শুধু মাত্র ভারতে গমনকারী উপজাতীয়দের 'সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন' করার কথা আছে। অথচ ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত

---

৩. দেবযানী দত্ত বসু রায়, চৌধুরী, *পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম*, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইট, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৭

Dhaka University Institutional Repository



যে সব নর-নারী সাবেক পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) হতে ভারতে প্রবেশ করেছে তারা ভারতীয় নাগরিক। [৪] কিন্তু ভারত 'জনসংহতি সমিতিকে' অঘোষিত চাপ প্রয়োগ করে এসব চাকমাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সরকারকে চুক্তিতে উল্লেখ করাতে সক্ষম হয়েছে।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্বন্ধে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং তারিখে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার মিন্টো রোডস্থ সরকারী বাসভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন,

"এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সরকার ও জাতি হিসেবে আমরা দুর্বল হব, আমাদের অর্থনীতি আরও নড়বড়ে হবে, প্রশাসনের আস্থা আরও কমে যাবে, সীমান্ত রক্ষা পদ্ধতির শক্তি হ্রাস পাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষা সংখ্যালঘুদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা আশংকাজনকভাবে বিঘ্নিত হবে।

সমগ্র দেশের জনগণের জীবনযাত্রায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে, আমাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জনজীবনে আশংকা দেখা দেবে। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী শক্তিসমূহের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সর্বদাই পার্বত্য এলাকায় শান্তি চেয়েছে এবং এখনও তাই চায়। আমরা চাই উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত বসবাসকারী শান্তিতে বসবাস করবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ ও দেশ গড়ে তুলবে; কিন্তু তা দেশের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে অথবা অ-উপজাতীয়দের স্বার্থ ও অধিকার বিসর্জন দিয়ে অথবা তাদের বংশ পরম্পরায় ২য় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে নয়।

সরকারের সই করা তথাকথিত শান্তিচুক্তি জনগণ এবং জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১। এই চুক্তির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল হতে স্বাধীন-সার্বভৌম এককেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে এদেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সংকট সৃষ্টি করেছে।

২। এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের 'বিষবৃক্ষ' রোপিত হয়েছে।

৩। চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

৪। সংবিধানের ১নং ধারায় বলা আছে, বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। সুতরাং সংবিধানে পৃথক কোন আঞ্চলিক পরিষদ বা প্রদেশ করার বিধান নেই। চুক্তির 'গ' অধ্যায়ের ১নং

---

৪. *দৈনিক দিনকাল*, (ঢাকা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



পংক্তিতে যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের ১নং ধারার পরিপন্থী।

৫। বাংলাদেশের সংবিধানে অঞ্চলভিত্তিক মন্ত্রী নিয়োগের কোন বিধান নেই। চুক্তির মাধ্যমে একটি বিশেষ অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রণালয় সৃষ্টি এবং তাকে সহায়তা করার জন্য নির্দিষ্ট ঐ অঞ্চলভিত্তিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার অধীনে একটি আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাহী ও সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ বাংলাদেশ সরকারের বিপরীতে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের শামিল বিধায় এই চুক্তি অবৈধ এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

৬। এই চুক্তি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে পার্টী বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, যা সংবিধানের ২৯ নং ধারার পরিপন্থী।

৭। চুক্তির গ খণ্ডের ১৩ ধারার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা জাতীয় সংসদের প্রধান ক্ষমতা খর্ব করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত। জাতীয় সংসদের সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার এই প্রচেষ্টা দেশবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৮। সংবিধানের ৩৬ ধারাবলে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি নাগরিকের বাংলাদেশে সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন একটি মৌলিক অধিকার। চুক্তির খ অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তি সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার লংঘন করেছে।

৯। সংবিধানের ৪২(১) ধারার অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। চুক্তির ২৬ নং পংক্তি বাংলাদেশের নাগরিকদের এই মৌলিক অধিকার খর্ব করেছে।

১০। বাংলাদেশ সরকারের যে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি অধিগ্রহণ, ইজারা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রয়েছে সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে এই সরকার চুক্তির মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে সমর্পণ করেছে। এতে সরকারের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

১১। এই চুক্তির মাধ্যমে এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা ভাষী নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার হরণ করে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সীমিত করে চাকরি, জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদিতে বাধা সৃষ্টি করে এদেশের সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository



১২। জেলা প্রশাসক পদ বিলুপ্তি ও কমিশনারের দায়িত্ব- ক্ষমতা ও কর্তব্য সীমিতকরণ ও সমস্ত সরকারী আধা- সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, শান্তি- শৃংখলা রক্ষা বাহিনীদের সরকারের অধীনে না রেখে বস্তুত পার্বত্য পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে একই দেশে ২টি ভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার জটিলতা সৃষ্টি এবং সরকারী/আধা-সরকারী কর্মচারীদের মর্যাদা নিম্নমুখী করা হয়েছে। সরকারী প্রশাসনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের বাকি অংশেও জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

১৩। উপজাতীয় মন্ত্রী নিয়োগ এই চুক্তিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উপর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

১৪। সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চলাচল সীমিতকরণ এবং তাদের পরোক্ষ ভাবে পার্বত্য পরিষদের অধীনস্থকরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা,কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মান এবং মর্যাদাহানিকর ।

১৫। এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ বহু জমির উপর সরকারেব অধিকার থাকা সত্ত্বেও চুক্তিতে বহু স্থানে এই সরকারী স্বার্থ তথা সমগ্র দেশের জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হয়েছে। এমনকি সরকারের নতুন জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা ও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

১৬। সরকার কর্তৃক নানা ধরনের ট্যাক্স, খাজনা, টোল আদায়েব, ক্ষমতা প্রত্যাহার, ভূমি, পুলিশ, পর্যটন, বিচারে বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে, শিল্প স্থাপনের অনুমতি সংরক্ষণ,খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পরে লাভের কমিশন ব্যবস্থায় ইত্যাদি বহু বিষয়ে সরকার নিজস্ব অধিকার, ক্ষমতা ও রাজকোষে অর্থ উপার্জন সংকুচিত করেছে।

১৭। সরকার সহিংসবাদীদের পুরস্কার দিতে রাজি হয়েছে, নগদ অর্থ দান, জীবিকা ব্যবস্থা এবং মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা এবং মামলা প্রত্যহারের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে নিরীহ অ-উপজাতীয়দের মধ্যের যাদেব স্বজন নিহত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহার করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

১৮। পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সরকার নিজস্ব ক্ষমতা পরিষদের কাছে সমর্পণ করেছে।" [৫]

---

৫. *The Daily Star*, (Dhaka, 4th December, 1997)

Dhaka University Institutional Repository



বিএনপি এই চুক্তির বিরোধীতা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ই ডিসেম্বর সকাল সন্ধা হরতাল পালন করে। অবশ্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের এই বিপক্ষ যুক্তিও বিচার বিশ্লেষণ যোগ্য। নিম্নে আমরা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

১। বাংলাদেশ সংবিধানের ১নং ধারায় বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন, ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হইবে।" বিএনপি র ১৮ দফা আপত্তির প্রথম ও চতুর্থ দফা অনুযায়ী চুক্তির কোথাও লেখা হয়নি, 'বাংলাদেশ একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র থাকবে না'। অথবা বাংলাদেশের নাম বদলে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে ভীতি থাকলেও মূলত কোন মৌলিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদের না থাকায় দেশের এককেন্দ্রিক ক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

২। বিএনপি শান্তিচুক্তি খণ্ডনের ৫ নং দফায় বলেছে, পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিত মন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা সংবিধানে নেই। মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫/(১১) অনুচ্ছেদে লেখা আছে "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রীসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে।" মন্ত্রী নিয়োগের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সংবিধানের ৫৬ (২) অনুচ্ছেদে আছে, "প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী দিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।" মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে উপরোক্ত বাধা ছাড়া আর কোন বাধা নেই। দেশে যেমন সমাজের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়ে থাকে তেমনি ভূখণ্ডভিত্তিক উপজাতি অধ্যুষিত পাহাড়ী অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐ ভূখণ্ডভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে একটি সেক্টর বিবেচনা করা হয় তাহলে তা মোটেই সংবিধান, দেশ ও সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে যাবে না।

৩। বিএনপির ১৪ নং দফা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী, আনসার এদেরকে পার্বত্য পরিষদের পরোক্ষভাবে অধীনস্থ করার কথা বলা হলেও চুক্তিতে কিন্তু অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় পর্যায় ক্রমে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা আছে কিন্তু স্থায়ী সেনানিবাস গুলো উঠিয়ে নেয়ার কোন কথা বলা হয়নি। বস্তুত স্থায়ী সেনানিবাস গুলোই হচ্ছে নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণের প্রধানকেন্দ্র।

*Dhaka University Institutional Repository*



৪। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৬ নং দফা অনুযায়ী "এই চুক্তি বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করতে গিয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যা সংবিধানের ২৯ নং ধারার পরিপন্থী।" এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯ নং ধারায় লেখা আছে :

২৯/(১) "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

২৯/(৩) "এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দ্যেশে তাঁহাদের অনুকুলে বিশেষ-বিধান প্রণয়ন করা হইতে, ..... রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করা যাইবেনা।"

সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রশ্নই আসেনা। বিএনপি আমলেও উপজাতীয়দের জন্য, মেয়েদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা ছিল।

৫। বিএনপির ২ নং দফায় বলা হয়েছে, "এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের 'বিষবৃক্ষ' রোপিত হয়েছে।"

আসলে পৃথিবীর সব দেশেই উপজাতীয় সমস্যাকে ভিন্ন বিবেচনায় দেখা হয়, সে জন্যই ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি আলাদাভাবে জারি করা হয়েছিল। স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসান এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়া জোরদার করে পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো, সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করার কারণে অন্যান্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তবে কোনো দল বা শক্তি যদি বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কে দেয় সেটা স্বতন্ত্র কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শান্তির প্রশ্নটি একটি বড় ধরনের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়েছে। যদিও সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা এখনও এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন না। দু'একজন যাও মতামত ব্যক্ত করেছেন তাও অনেকটা অস্পষ্ট। এর ফলে বিভ্রান্তি আরো বাড়ছে। এ প্রেক্ষিতে সব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে দুর্দশা বেড়েই চলবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংহতির স্বার্থেই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রয়োজন। শান্তিচুক্তির মধ্যে কোন অসংগতি থাকলে সমগ্র দেশবাসীর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং জনসংহতি সমিতিই পারে এই সমস্যার সন্তোষজনক সংশোধন করতে। কাজেই এক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সংশ্লিষ্ট সকলের সদিচ্ছা থাকলেই এই শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এই চুক্তির বাস্তবায়ন বাংলাদেশে জাতিগঠন সমস্যার সমাধানে এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

## নবম অধ্যায়

# বিশ্লেষণ ও উপসংহার

জাতিগঠন কিভাবে সম্ভব এর যেমন কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই তেমনি নেই কোন আদর্শগত সমাধান। জাতিগঠনের জন্য প্রয়োজন কর্তৃত্বের ব্যাপক ব্যপ্তি আর দায়িত্বশীলতা ও অংশ গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ। এই কর্মকাণ্ড যতদিনে এদেশে বাস্তবায়িত হয়নি ততদিনে সমস্যা সমাধানে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহী সমস্যা এদেশটির সবগুলো সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে তার সুষ্ঠ ন্যায়সংগত সমাধান ছাড়া জাতিগঠন সম্ভব হচ্ছে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতিগঠনের কাজ তিনটি কারণে অবহেলিত হয়।[১]

প্রথমতঃ এসব দেশের নেতৃবর্গকে একই সাথে জাতিগঠন ও রাষ্ট্রগঠনের কাজে হাত দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্নটি বিরাট আকার ধারণ করে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতৃবর্গ জাতিগঠনের পরিবর্তে রাষ্ট্রগঠনের দিকেই মনোযোগ দেন।

তৃতীয়তঃ সাধারণভাবে প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রে *(Post Colonial)* যেসব সরকারী কাঠামো বিদ্যমান তার ফলে ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে অতি সহজে। ফলে জাতিগঠন অবহেলিত হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের সরকার নতুন সদ্য স্বাধীন দেশ গঠনের পাশাপাশি জাতিগঠন করতে যেয়ে উপজাতীয়দেরকে জাতিতে প্রমোশন দেয়া এবং তাদেরকে বাঙালী জাতিসত্তার সাথে মিশে যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করে প্রকারান্তরে রাজনৈতিক দিক দিয়ে চরম অসন্তোষের জন্ম দিয়েছেন। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশে এর জন্য অবকাঠামো আগেই তৈরী করা হয়েছে। ঐ সব দেশের সমস্যা হচ্ছে যে সব "গ্রুপ বা গোষ্ঠী এখনও বিদ্যমান কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ হয়নি" তাদের সংহত করা। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সর্বপ্রথম জাতীয় সংহতির অবকাঠামো রচনা করতে হয় তারপর বিভিন্ন গ্রুপকে জাতীয় মোজায়েকে *(Mosaic)* সম্মিলিত করে রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হয়।

বাংলাদেশে জাতিগঠন কার্যক্রমে বিভিন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যকার আন্তঃশ্রেণী দ্বন্দ্ব এবং গ্রুপগুলোর মৌলিক অধিকার হরণ ও মানবাধিকার লংঘনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ব্যর্থতা সংহতির গুরুতর সংকট এনে দেয়। ফলে বিভিন্ন গ্রুপকে জাতীয় মোজায়েকে সম্মিলিত করে রাষ্ট্র গঠনে অগ্রসরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ

---

১. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬

Dhaka University Institutional Repository



এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উজ্জ্বল। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বৈষম্য, নিপীড়ন, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র এবং অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে তার সুষ্ঠু সমাধান ব্যতীত জাতীয় সংহতি অর্জন দুষ্কর। বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রকমের সহিংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু সংখ্যক হিন্দু দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও অবহেলিত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এই অবহেলা ও বঞ্চনার প্রেক্ষিতে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের সৃষ্টি।

বাংলাদেশে নৃতত্ত্বগত দিক দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হচ্ছে দেশের উপজাতি সম্প্রদায়। বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠীর অমানবিক আচরণ জাতীয় সংহতি অর্জনে বাধার সৃষ্টি করেছে। আলোচ্য গবেষণায় আমরা এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পাই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সম্প্রীতির অভাব, শাসকগোষ্ঠীর মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অসম বন্টন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হরণে কুট কৌশল গ্রহণ উপজাতীয়দের মধ্যে সহিংস বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপের জন্ম দেয়। এ ভাবেই ধীরে ধীরে জাতি গঠনে নেমে আসে বিপর্যয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১৩টি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বঞ্চনার ইতিহাস বহু পুরনো। ৫০৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে এই পার্বত্য অঞ্চলটি দেশের বৃহত্তম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামল থেকেই দেখা গেছে, কখনই এ অঞ্চলের আদিবাসীরা পূর্ণ অধিকার পায়নি। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের আগমন নিষিদ্ধ এবং উপজাতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিলেও তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। আবার পাকিস্থান সৃষ্টির পর ম্যানুয়েল পরিবর্তন করায় রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ আদিবাসীরা পেলেও বহিরাগতদের বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়। ফলে ক্ষোভের নিবসন হয়নি ঐ অঞ্চলের মানুষের। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জটিলতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। উপজাতীয়রা স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে তৎকালীন সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে উপজাতীয়রা জনসংহতি সমিতি নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এর অধীনে গঠিত হয় সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন শান্তিবাহিনী। ১৯৭৪ সাল থেকে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। এর জবাবে সরকারও নিরাপত্তাবাহিনী প্রেরণ করে। সংঘাতের মধ্য দিয়েই কেটেছে গত তেইশ বছর। ক্ষমতারোহনের পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাসম্ভব রাজনৈতিক দাবী দাওয়া পুরণ এবং জাতিসত্তার মূল্যায়ন না করে সামরিক প্রক্রিয়ার সহায়তায় দেশের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository



সমতল ভূমি থেকে প্রলোভন দিয়ে লাখ লাখ বাঙালীকে পুনর্বাসন করায় সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। একটি জাতিসত্তা যখন বুঝতে পারে পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে, যখন বুঝতে পারে যে আবাস ভূমিতে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে সে বাসভূমি থেকে তাদের বিতাড়নের অপচেষ্টা চলছে তখন সংগত কারণেই অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তারা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে চক্রান্ত প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর হবেই। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জন্ম হয়েছে শান্তিবাহিনীর, সৃষ্টি হয়েছে সশস্ত্র সংঘাতের। জাতিগঠন প্রক্রিয়া ভুল পথে এগুনোর মাশুল দিয়েছে গোটা দেশবাসী। সামরিক বাহিনী, পুনর্বাসিত বাঙালী, শান্তিবাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ নিরপরাধ জনগণ প্রাণ হারিয়েছে অবলীলায়। শান্তির নামে যে তাজা তাজা রক্ত ঝরেছে পাহাড়ে তার মূল্যায়ন হয়নি পরবর্তীতেও। ১৯৮২ সালে ক্ষমতায় এসে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এতে সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান হয়নি। বরং বাংলাদেশের জাতীয় সংহতির সমস্যা এভাবেই জটিল আকার ধারণ করে।

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের সময়ও মোট ১৩টি বৈঠক হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বাপর আশাহত হয়েছে পার্বত্য উপজাতীয়রা। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন সুষ্ঠু রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেখানে গড়ে ওঠেনি। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ইং তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংসদ বেগম মেহের আফরোজের এক প্রশ্নের উত্তরে সংসদকে জানান ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২১ বছরে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকায় শান্তিচুক্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১০৫ কোটি ৯৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা।[২] সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায় গুটিকয়েক সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হলেও তারা পার্বত্যবাসীকে প্রতিনিধিত্ব তথা তাদের আশা আকাঙ্খার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত নেতৃত্ব সমস্যাকে জটিল ও দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি করে।[৩] জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ পর্যন্ত সময়ে সেনাবাহিনী দায়বদ্ধহীন সার্বভৌম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সাত্তার থেকে খালেদা জিয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর কেন্দ্রিক শক্তিশালী অবস্থান বিশ্লেষণযোগ্য।[৪]

---

২. *The Independent,* (Dhaka, 8th February, 1998)
৩. উথোয়াই চিং, *মূলধারা,* পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ, বৈ-সা-বি, প্রকাশনা-১, পৃষ্ঠা ২৪
৪. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের প্রবন্ধ, "খালেদা জিয়ার জেহাদ", *দৈনিক জনকণ্ঠ,* (ঢাকা, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository



বিশ্ব আজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সভ্যতার নিজস্ব নিয়মেই বদল হচ্ছে সব চালচিত্র। মানুষের মন ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বেরিয়ে বৃহৎ স্বার্থের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। একের সাথে অপরের মেল বন্ধনের মাধ্যমে, সাহায্য সহযোগীতার মাধ্যমে সে দূরকে করেছে আপন, অসম্ভবকে করেছে জয়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রীক সমস্যা সমাধানে করেছে নতুন তত্ত্বের আবিস্কার। পুরানো ধ্যান ধারণার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছে। সংহতির বীজ বুনতে তৈরী করেছে নতুন নীতিমালা। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্থান, চীন, কানাডা, ব্রিটেন, স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, ইতালী, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশের আদিবাসী বা উপজাতি সংক্রান্ত সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান দেশগুলোর মর্যাদাকে করেছে মহিমান্বিত।

ভারতের মিজোরামে মিজোদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনসহ তাদের আইন-কানুন, রীতিনীতি ও ভূমির অধিকারের বিষয়গুলো যাতে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত থাকে সেজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। ভারতের সংবিধানে আসাম, মিজোরাম ও ত্রিপুরার সংখ্যালঘু উপজাতীয়দের জন্য সীমিত স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন- মিজোরামে চাকমাদের স্বায়ত্ব শাসিত জেলা কাউন্সিল। এতে ভারতের অগ্রগতি ব্যহত হয়নি, বরং ভারত তার জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্থানে অনুন্নত পশ্চাৎপদ ও সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জাতীয় স্বীকৃতিসহ পৃথক শাসনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। চীনের সংবিধানেও বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছে। কানাডার সংবিধানেও বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, জাতিসত্তা ও উপজাতীয় গোষ্ঠীর স্বার্থ জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিধান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- কুইবেক, ব্রিটেন, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সংবিধানে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জন্য সার্বভৌম বহির্ভূত সর্ব অধিকার ভোগের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। ইতালী, ফিনল্যান্ড এবং বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানেও সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারসহ অধিকতর স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়েছে।

আসলে সদিচ্ছা থাকলে সমস্যার সমাধান কোন কঠিন ব্যাপার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সৃষ্টি একদিনে হয়নি। অল্প অল্প করে এই সমস্যার আগুনে ঘি ঢেলে একে এতোদিন ধরে জলন্ত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্বত্যবাসী অসন্তুষ্ট, অভিমানী, অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিরাপত্তাহীন। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয় কোটা প্রবর্তন করা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে পাহাড়ীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। যাতায়াতে বিধিনিষেধ, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি বহনে নিষেধাজ্ঞা, ওষুধপত্র খরিদের নিষেধাজ্ঞা, নীল কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা, বিনা অনুমতিতে তল্লাশী প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য এই অসন্তুষ্টির কারণ। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ে প্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পাহাড়ীদের অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদে কোন প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। সামরিক বাহিনীতে

Dhaka University Institutional Repository



কমিশন পদে কোন উপজাতীয়কে নিয়োগদান করা হয়নি। উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন কোন পাহাড়ীকে জেলাপ্রশাসক পদে নিয়োগ করা হয়নি। ব্যাংক ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অলিখিত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। আর পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন সহ সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে আবারো শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটি জনসংহতি সমিতির সাথে সাতটি বৈঠক শেষে গত ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বহুল প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

চার খণ্ড এবং ৬৮ টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এ সমঝোতা স্মারক পার্বত্য আদিবাসীদের স্বশাসন এবং কর্তৃত্বকে সংরক্ষণ করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা বলেছেন, এ চুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশাবাদী।[৫] গেরিলা যোদ্ধারা অস্ত্রসমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। আর বিদ্রোহ দমনের সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে সরকার সেখানে সেনাবাহিনী নিয়োগ করেছিল। তখন থেকেই সেখানে যুদ্ধাবস্থা। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর সেনাবাহিনী এই মত ব্যক্ত করেছে যে, সামরিক বল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান দীর্ঘায়িত করতে তারা অনাগ্রহী, তারা দ্রুত শান্তি চায়। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি বলেছে, তারা রাজনৈতিক সমাধান চায়, সামরিক নয়। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্বাক্ষর সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হয়েছি। এখন পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করতে হবে। উপজাতীয়রাও এদেশের নাগরিক এবং তাদেরও অধিকার আছে দেশের অন্য অঞ্চলে বসবাসরত ভাইদের মত নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করার।[৬]

অবশেষে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী '৯৮ ইং তারিখে দু'যুগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান কল্পে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পনের মধ্যদিয়ে শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আলোর মুখ দেখে। ৪০ হাজার দর্শক সমৃদ্ধ নবনির্মিত খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত কুটনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, কয়েক'শ সাংবাদিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রথম পর্যায়ে শান্তিবাহিনীর ৭৩৯ জন সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দিয়েছেন।[৭] জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সর্বপ্রথম তাঁর চাইনিজ এস. এম. জি

৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, (ঢাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)
৬. *Ibid.*
৭. *The Bangladesh Observer*, (Dhaka, 11th February, 1998)

Dhaka University Institutional Repository



তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। শান্তিবাহিনীর প্রথম দলটি মোট ৪৬৩টি অস্ত্র এবং ১,০৯৮টি গোলাবারুদ জমা দিয়েছে। [৮] অস্ত্র সমর্পনের দ্বিতীয় ব্যাচে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাঘাইছড়িতে শান্তিবাহিনীর ৫৪৩ জন সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের উপস্থিতিতে তাদের অস্ত্র জমা দেয়। অস্ত্র সমার্পণের তৃতীয় ব্যচে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ্‌র কাছে ৪৩৩ জন সদস্য অস্ত্র জমা দেয়। এর পরে বাকীরা চতুর্থ ব্যাচে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসের এর কাছে তাদের অস্ত্র জমা দেয়। অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এস এল আর, জি-৩ রাইফেল, চাইনিজ রাইফেল, ৯ এম এম এস এম জি, থ্রী নট থ্রী, এল এম জি, একে-৪৭ রাইফেল্ড, স্টেনগান, রকেট লাঞ্চার, মর্টার, টমিগান, দেশী বন্দুক। [৯] ১০ই ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় ৪২ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় বলেন, "অতীতের সরকারগুলো পার্বত্য সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কখনও কখনও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সমাধান চেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি ছিল মূলতঃ একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আমিই প্রথম '৮২ সালে এ সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে ঘোষণা করি এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাই।" [১০] তিনি ঘোষণা দেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিজ্ঞানও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে সকল দিক থেকে উন্নয়নের আদর্শ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এ সরকার। ইতোমধ্যেই বরাদ্ধ করা হয়েছে ১৬৮ কোটি ১৭ লাখ টাকা। পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট ২ হাজার ১৪৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।" [১১] প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সংঘাত নয় শান্তি চাই, ধ্বংস নয় সৃষ্টি চাই, পশ্চাৎপদতা নয় অগ্রগতি চাই।" [১২]

১৮৮৫ সালে ভিক্টর হুগো যখন প্যারিসে মারা যান তখন তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল একটি স্বপ্নের ভাষ্য। "আমি সেই দলের প্রতিনিধিত্ব করি যার এখনও জন্ম হয়নি। আমার সেই দল বিপ্লবের, সর্বজনীন সভ্যতার। সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে প্রথমে ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে সারা পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র।" ভিক্টর হুগো যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটি রাজতান্ত্রিক নয়, গণতান্ত্রিক। সামন্তবাদী নয়, স্বাধীন। গতানুগতিক অবক্ষয়ের নয়, সৃজনশীল বিদ্রোহের। সেখানে উচ্চারিত হবে শ্রেণীগত, সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মভিত্তিক সব রকম বৈষম্য নিপীড়ন থেকে মুক্তির গান। সেখানে মানুষের স্বাধীনসত্তা বন্ধনের শেষ শৃঙ্খল খুলে ফেলবে।

---

৮. *The Independent*, (Dhaka, 11th February, 1998)
৯. *The New Nation*, (Dhaka, 17th February, 1998)
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, (ঢাকা, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)
১১. *Ibid.*
১২. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository



সাংস্কৃতিক, ভাষাভিত্তিক অথবা গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই থাকবে। বিভিন্ন মানুষ এবং তাদের বহুবিধ সমাজ যেমন বিভিন্ন ভাবে রান্না করে, পোশাক পরে, ছবি আঁকে অথবা প্রার্থনা করে একটি সংস্কৃতি আরেকটি সংস্কৃতি থেকে ঠিক তেমনি একইভাবে আলাদা। কিন্তু মানুষের আত্মা যখন বন্ধনহীন তখন সে পরিবেশ সংস্কৃতির বিভাজন স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে।

সন্দেহ নেই, পৃথিবী এখনও বহুধাবিভক্ত। দ্বন্দ্ব বিরোধ, সংঘাত-প্রতিরোধ সবই বিদ্যমান। কিন্তু ইথারের তরঙ্গে সংবাদ পরিবহনের আকাশজুড়ে সড়ক পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে একটি সর্বাঞ্চলে। সেখানে কোনো দূরত্ব নেই। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে মানুষ পেয়ে যাচ্ছে তার তাৎক্ষণিক খবর।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন তৈরী হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বাজার, রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় তেমনি ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে, একটি দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্ব। যখন কোনো দেশের শাসন প্রশাসন কেন্দ্রীভূত তখন সাধারণত সেই দেশের সম্পদ সমৃদ্ধি ক্ষমতাধরদের ক্ষুদ্র বলয়ে সীমাবদ্ধ থেকে, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়না। অথচ যদি আমরা দু'হাজার বছর আগের গ্রীসের নগর গণতন্ত্রে ফিরে যাই সেখানে দেখা যায় যে, ছোট বড় সকলের কণ্ঠস্বর সমানভাবে স্বীকৃত। আজকের পরিভাষায় বলা যেতে পারে, স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার কথা- যার বৃত্তে আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সুযোগ প্রয়োজন। আশা-আকাঙ্খা বিস্তৃত ভাবে বিন্যস্ত। তখনই সম্ভব বিচিত্র অথচ সংহত সমাজের বিকাশ। কারণ স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ভাল-মন্দ সেখানের মানুষেরা তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করতে পারে, যেমন তারা পারে না কেন্দ্রের দূরাগত শঙ্খধ্বনিকে।

দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জিভূত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা বাংলাদেশে জাতিগঠন কিংবা জাতীয় সংহতি অর্জনে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল তা থেকে জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের মানুষ তাই এখন গভীর আশা ও আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে। সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে কবে পাহাড়ী-বাঙ্গালী মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্বরে গেয়ে উঠবে দেশের জয়গান।

*Dhaka University Institutional Repository*

## গ্রন্থপঞ্জী


আহমদ, আবুল মনসুর : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা

আহমদ, এমাজউদ্দীন : "বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি : ক'টি প্রশ্ন", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭

——————— : *বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪

আজাদ, ইবনে : "বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭

উমর, বদরুদ্দীন : "বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭

——————— (সম্পাদিত) : *পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

খান, এনায়েতুল্লাহ : "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭

খীসা, প্রদীপ্ত : *পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, আগষ্ট, ১৯৯৬

ঘোষ, সুবোধ : *ভারতের আদিবাসী*। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক *আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!* ঢাকা, ১৯৯৭

চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ : *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ*, স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, ১৯৯৩

——————— : *তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা*, ঢাকা, ১৯৯১

চাকমা, বিপ্লব : *পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকারের সন্ধানে*, পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা-০০১, এপ্রিল ১৯৯৭

চাকমা, সিদ্ধার্থ : *প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম* , নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা; ১৩৯২

চৌধুরী, আবদুল গাফফার : *আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী?* অক্ষরবৃত্ত প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩

চৌধুরী, দেবযানী দত্তরায় : *পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্তের রাজনীতি ও সংগ্রাম*, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, সাউথ এশিয়া ফোরাম ফর হিউম্যান রাইট, কলিকাতা; ১৯৯৬

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ : *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭

মজুমদার, মাসুদ ( সম্পাদিত) : *আহা পর্বত! আহা চট্টগ্রাম!!* পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্মারক ঢাকা, ১৯৯৭

মে, আলমুট : *দি ইকোনমি অব শিফটিং কালটিভেশন ইন বাংলাদেশ*, (মিমি ও বার্লিন, ১৯৭৮)

রহমান, আসহাবুর : "বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমস্যা" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর : *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, দ্বি-স, ঢাকা, ১৯৮৯

রাজ্জাক, আবদুর : "বাঙলাদেশ : জাতির অবস্থা" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository




রায়, সুপ্রকাশ : *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা, ডি.এন.বি.এ. ব্রাদার্স, ১৯৭২

সাত্তার, আব্দুস : *আরণ্য সংস্কৃতি*, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৭৭

হক, আবদুল : "দোদুল্যমান জাতীয়তা", মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭

Ahmad, Aijaz : *Literature among the signs of our time, in theory*, Bombay : Oxford University Press, rept 1933

Ahmed, Kamruddin : *A socio-political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*.

Azad,Maulana Abul Kalam : *India Wins Freedom*, Orient Longman, New Delhi, 1989

Barakat, Abul, Uzzaman, Safiq, Rahman, Azizur and Poddar, Abhijit : *Political Economy of the vested property Act in Rural Bangladesh*, Association For Land Reform And Development (A.L.R.D.), Dhaka, 1997, pp. 1-22.

Bhaba, Home : "Dissemi Nation : Time Narrative and the Margins of the Modern Nation", *The Location of culture*, London : Routtedge, 1994

Bindra. S. S. : *Indo-Bangladesh Relations*, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1982,

Brass, Paul R. : "Ethnic Groups and Nationalities : The Formation, Persistence and Transformation of Ethnic identities over time", Quoted in Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka, BBI, 1980

Brissenden Rosemary and Griffin, James (eds.) : *Modern Asia : Problems and Politics*, Brisbane (Australia) : The Jacaranda Press, 1974.

Cham, Boon-Ngee : *Toward and Malaysian Malaysia: A Study of Political integration*, Ph.D. thesis. The University of Alberta, Canada, Spring 1971.

Chowdhuri, R. I. and others, : *Tribal Leadership and Political Integration*, Chittagong University, 1979. Collins, Larry and Lapierre, Dominique : *Freedom at midnight*, Tarang Paperbacks, New Delhi, 1988.

Dhaka University Institutional Repository



Deutsch, Karl W. and Foltz, William J. (eds.) : *Nation-Building*, New York Atherton Press, 1963.

Emerson, Rupert : *From Empire to Nation*, Boston: Beacon Press, 1960.

Esman, Milton J. : "The Politics of Development Administration" in John D. Montgomery and William J. Siffin, (eds.) *Approaches to Development : Politics, Administration and Change*, New York: 1966.

Etzioni, Amitai : *Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1965.

Foucault, Michel : *What are we today*? Technologies of the self, (ed.) H. Gutman, London : Tavistock 1988.

Furnivall, J.S. : *Colonial Policy and Practice* London, Cambridge University Press, 1948.

Geertz, Clifford : "The Integrative Revolution : Primordial Sentiments and Civil Politics in the new states", in C. Geertz (ed.) *Old Societies and New States- The Quest for Modernity in Asia and Africa*, New York : The Free Press of Glencoe, 1963.

Hafiz, M. Abdul and Khan, Abdur Rab (ed.) : *Nation Building in Bangladesh retrospect and prospect*, BIISS, Dhaka 1986.

Hass, Ernest B. : *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957*, California: Stanford University Press, 1958.

Hunter, W. : *A Statistical Account of Bengal*, New Delhi, D. K. Publishing House, Vol. 6, 1973.

Iftekharuzzaman & Rahman, Mahbubur : "Nation Building in Bangladesh: Perceptions, Problems and an Approach" in M. Abdul hafiz and Abdur Rab Khan edited *Nation Building in Bangladesh retrospect and prospect*, BIISS, Dhaka 1986.

Islam, M. Nazrul : *The Politics of National Integration in new States : A Comparative Study of Pakistan and Malaysia 1957-1970*, Ph.D. dissertation, Griffith University, Australia, 1984.

Dhaka University Institutional Repository




———— : *Problems of Nation Building in Developing Countries: The Case of Malaysia*, University of Dhaka, 1988.

———— : *Pakistan and Malaysia : A Comparative Study in National Integration,* Sterling Publishers Ltd. New Delhi. 1989 India.

———— : "Bangladesh" in J.C. Johari, et. al., *Government and Politics of South Asia,* Sterling Publishers Ltd. New Delhi. 1989 India.

Jacob, Philip E. and Teune : Henry "The Integrative Process: Guidelines for Analysis of the Bases of Political Community" in Philip Jacob and James Toscano (eds.) *The Integration of Political Communities*, New York; J. B. Lippincott Co., 1964.

Jahan, Rounaq : *Pakistan : Failure in national integration.* Columbia University Press, 1972.

———— : "India, Pakistan and Bangladesh" in G Henderson, Richard N. Lebow and John G. stoessinger (eds.) *Divided Nations in a Divided world*, New York : David Mckay Company, Inc. 1974.

———— : *Bangladesh Politics: Problems and issues*, UPL, Dhaka, 1987.

Kautsky, John H. (ed.) : *Political Change in Underdeveloped Countries*, New York : Wiley, 1962.

Levy-Strauss, Claude : *Introduction to the work of Marcel Mauss, Trans, Felicity, Baker*, London: Routledge, 1987.

Lewin, T.H. : "The Hill Tracts of Chittagong and theDwellers Therein".

Maloney, Clarence T. : "Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture", in M. S. Qureshi (ed.) *Tribal Cultures of Bangladesh,* Rajshahi University, Institute of Bangladesh Studies (IBS) 1984.

Maniruzzaman, Talukder : *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka, BBI, 1980.

———— : *Group Interests and Political Change*, Studies of Pakistan and Bangladesh, New Delhi: South Asia Publishers, 1982.

Mascarenhas, Antony : *Bangladesh A Legacy of Blood,* London, 1986.

Dhaka University Institutional Repository



Montgomery, John D. and Siffin, William J. (eds.) : *Approaches to Development : Politics, Administration and Change*, New York: 1966.

Organski, A. F. K. : *The Stages of Political Development*, New York, Knopf, 1965.

Pandey, B. N. : *South and South East Asia 1945-1979 : Problems and politics*, London : The Macmillan Press, Ltd. 1980.

Pye, Lucian W. : "Identity and political culture" in Binder et. al. *Crisis and Sequences in political development*, Princeton N. J. Princeton University Press, 1972.

——————— : *Aspects of political Development* Boston, little, Brown and Company (Inc.) 1966.

Qureshi M. S. (ed.) : *Tribal Cultures of Bangladesh*, Rajshahi University, Institute of Bangladesh Studies (IBS) 1984.

Ramakant (ed.) : *Regionalism in South Asia*, Asia Studies centre, Aalekh Publishers, Jaipur, India.

Razzaq, Abdur : *Bangladesh state of the Nation*, University of Dacca, Bangladesh (January, 1981).

Riggs, Fred W. : *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Houghton Mifflin Co., 1964.

Rob, M. A. : *Resource Potentials and Geopolitical Significance of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Seminar Paper Presented at A. M. U. G. S. (September, 1991) Aligarh, India.

Roumani, Maurice M. : *National Integration-A Conceptual Frame Work Plural Societies*, Vol. 9, No. 2 and 3, (Summer /Autumn 1978).

Roy, Raja Devasish : "The Erosion of Legal and Constitutional Safeguard of the Hill People of the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh: An Historical Account", ১৯৯২ সালে সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

Rustow, D. A. : "A World of Nations: Problems of Political Modernization", Washington: The Brookings institution, 1967

Said, Edward W. : *Resistance and Opposition, Culture and Imperialism*, New York : Alfred A. Knopt, 1993.

Dhaka University Institutional Repository



Sayeed, K. B. : *Power Elite's, Public Policies and Political Systems in south Asia,* Kingston, 1973.

Scott, Roger (ed.) : *The Politics of New States : A General Analysis with Case Studies from Eastern Asia,* London : George Allen and unwin Ltd., 1970.

Shelley, Mizanur Rahman : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, The Untold Story,* Centre for Development Research, Bangladesh (CDRB), 1992.

Shourie, Arun : *Growth poverty and Inequalities,* Foreign Affairs, (January, 1973).

Sukhwal, B.L. : *India : A Political Geography,* Allied Publishers, Bombay, 1971.

Susha, B. B. : *Indo-Bangladesh maritime Boundary Issue,* Strategic Analysis, 1977.

Welch, Calude W.Jr. (ed.) : *Political Mordernization, A Reader in the comparative change* California, Duxbury Press, 1971.

Weiner, Myron : *Modernization: The Dynamics of Growth,* New York; Basic Books Inc. Publishers, 1966

Wriggins, Howard : "National integration", in Myron Weiner (ed.), *Modernization : The Dynamics of Growth,* New York; Basic Books Inc. Publishers, 1966.

প্রবন্ধাবলী / সংকলন

আহমেদ, জেসমিন : "পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কতদিন রক্ত ঝরবে!", পাক্ষিক *চিন্তা,* (ঢাকা, বছর ৩, সংখ্যা ১৩, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪)

ইসলাম, শেখ নুরুল : "তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন : বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী", *দৈনিক দিনকাল,* (ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর ১৯৯৩)

ইসলাম, সৈয়দ নাজমুল : "দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ইন বাংলাদেশ : ইন্টিগ্রেশনাল ক্রাইসিস বিটুইন সেন্টার এন্ড পেরিফেরী", *এশিয়ান সার্ভে* (ভল্যুম ২১, নং ১২, ডিসেম্বর ১৯৮১)

কাদের, আহমদ আবদুল : "আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ", মাহবুবুর রহমান সম্পাদিত *মানব উন্নয়ন জার্ণাল,* (বর্ষ ২; সংখ্যা ১; মার্চ ১৯৮৯, ঢাকা-১০০০)

চাকমা, জুম বিজয় : "পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন : অতঃপর", *দি মেইন ষ্ট্রিম,* (ঢাকা, অনিয়মিত সংকলন, ১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository




চাকমা, দেশপ্রিয় : *এগজিসটেন্স*, (ঢাকা ট্রাইবাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯২)

চাকমা, বিপ্লব : *Ray*, (ঢাকা ট্রাইবাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯২)

চাকমা, ভূমিত্র : "পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত জাতীয়তাবাদ", *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, আগষ্ট, ১৯৯৩

চিং, উথোয়াই : *মূলধারা*, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বৈ-সা-বি, প্রকাশনা-১

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান : "খালেদা জিয়ার জেহাদ", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, (ঢাকা ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

দত্ত, ডেনীস দিলীপ : *স্বর্গ মর্ত*, (ঢাকা, ১৩৭ সংখ্যা, ১-১৫ মে, ১৯৯৭)

দে, দিলীপ (সম্পাদিত) : *গ্লানি (The Disgrace)* গ্লানি প্রকাশনা পরিষদ, চট্টগ্রাম, আগষ্ট, ১৯৯২

দেওয়ান, স্বাধীনতা : "বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অসন্তোষের ইতিকথা", *লাড়েই*, (ট্রাইবাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজুসংকলন, বাংলা ১৩৯০)

মন্টু, কাজী : "ট্রাইবাল ইমার্জেন্সি ইন চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্", *ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ভল্যুম ১৫, নং- ৩৬

মাসুদুজ্জামান : "পার্বত্য চট্টগ্রাম : সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদ" বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত পত্রিকা- *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা

মুহাম্মদ, আনু : "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধা কোথায়?" *প্রিয় প্রজন্ম*, (ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯২ সংখ্যা)

মুসা, আহমদ : "শান্ত-অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম", *মাসিক নিপুন*, (ঢাকা, জুন, ১৯৮৫)

রব, মোহাম্মদ আব্দুর : "পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূগোল ও ভূ-রাজনীতি", উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৯৬

রহমান, হাবিবুর : "পার্বত্য-বাংলাদেশের জুম চাষ", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, (ঢাকা, একবিংশ সংখ্যা, জুন, ১৯৮৮)

রায়, সলিল : "পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান", *বিজু সংকলন*, ১৯৭৯

সোফার, ভেভিড : "পপুলেশন ডিসলোকেশন ইন দি হিল ট্রাক্টস্" *দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ ৫৩*, ১৯৬৪

হক, আজিজুল : "বাংলাদেশ ইন ১৯৮১ : স্ট্রেইনস্ এন্ড স্ট্রেস", *এশিয়ান সার্ভে*, ভল্যুম ২১, নং ২

হোসেন, ফেরদৌস : "পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির সমস্যা", ড. আবুল কালাম সম্পাদিত *প্রবন্ধাবলী-৩*, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository



**Journal and Articles**


Ahasan, Syed Nazmul & Chakma, Bhumitra, : "Problems of National Integration in Bangladesh: The Chittagong Hill Tracts", *Asian Survey*, Vol. 29, No. 1, October, 1989.

Amin, M. N. : "Secessionist Movement in the Chittagong Hill Tracts", *Regional Studies*, 1988/89, Vol. VII, No. 1, Islamabad.

Binder, Leonard : "National Integration and Political Development", *American Political Science Review*, Vol. LVIII, No. 3 (September 1964) p.622

Burman, D. C. : "Regionalism in Bangladesh : The Study of Chittagong Hill Tracts", *Regionalism in South Asia*, (ed. by Ramakant), Asia Studies centre, Aalekh Publishers, Jaipur, India. pp. 116-137

Chowdhuri, M. I. : "Kaptai dam and Hydra-Electricity", *The Bangladesh Observer*, (Dhaka, May 27,1974)

Couner, Walker : "Nation Building or Nation Destroying", *World Politics*, Vol. XXIV No. 3, April, 1972.

Ford, Niek Aaron : *Cultural Integration Through Literature*, Teachers College Record, Vol. 66. No. 4, January 1965, pp. 332-337.

Grierson, G. A. : *Linguistic Survey of India* Vol. III, part II, Part III Calcutta, 1903.

Gross, Bertram M. : "Destructive Decision Making in Developing Countries", *Policy Sciences*, V (June, 1974), No. 2 , p. 214

Hossain, S. A. : "Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics", *The B.I I.S.S. Journal*, Vol. XII, No. 4, Dhaka.

Huntington, Samuel P. : "Political Development and Political Decay", *World Politics*, Vol. 17, No. 3, April 1965.pp. 386-430

Seers, Dudley : "The Meaning of Development" *International Development Review*, Vol. XI, No. 4.pp. 2-6

Sofar, David : "Population Dislocation in the Hill Tracts", *The Geographical Review*, 53 (1964).pp. 337-362

Dhaka University Institutional Repository



Weiner, Myron : "Political Integration and Political Development", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 358 (March 1965). p. 55

Wriggins, Howard : "Impediments to unity in new Nations : The case of Ceylon", *The American Political Science Review, Lv* (1961).p. 320

*Dhaka University Institutional Repository*

# তথ্যপঞ্জী


## দৈনিক পত্রিকা

*সংবাদ* : (ঢাকা, ১৪ই মে, ১৯৯২)
——— : (ঢাকা, ১০ই জুলাই, ১৯৯২)
——— : (ঢাকা, ১২ই জুন, ১৯৯৭)
——— : (ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)
*দৈনিক ইত্তেফাক* : (ঢাকা, ১৭ই জুন, ১৯৭৩)
——— : (ঢাকা, ১৬ই মে, ১৯৮৭)
——— : (ঢাকা, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)
*দৈনিক ইনকিলাব* : (ঢাকা, ২০শে আগষ্ট, ১৯৯৬)
——— : (ঢাকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৭)
*দৈনিক জনকণ্ঠ* : (ঢাকা, ১৬ই মে, ১৯৯৭)
——— : (ঢাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৭)
*দৈনিক দিনকাল* : (ঢাকা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭)
*দৈনিক বাংলা* : (ঢাকা, ১লা মার্চ, ১৯৮৯)
*ভোরের কাগজ* : (ঢাকা, ১৭ই মে, ১৯৯৭)

## সাপ্তাহিক পত্রিকা/ম্যাগাজিন

*সাপ্তাহিক একতা* : (ঢাকা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৮)
——— : (ঢাকা, ৯ই জুলাই, ১৯৯২)
*চলতিপত্র* : (ঢাকা, ১৭ই মে, ১৯৯৭ সংখ্যা)
*বিচিত্রা* : (ঢাকা, ১৭ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮)
*রোববার* : (ঢাকা, ২০ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৯৭)
*সুগন্ধা* : (ঢাকা, ৭ই অক্টোবর, ১৯৯১)
*যায়যায় দিন* : (ঢাকা, ২২শে জুন, ১৯৯৩ সংখ্যা)

## পাক্ষিক ম্যাগাজিন

*পাক্ষিক চিন্তা* : (ঢাকা, বছর ২, সংখ্যা ২৪ : ৩১শে শ্রাবণ, ১৪০০, ১৫ই আগষ্ট ১৯৯৩)
——— : (ঢাকা, বছর ৩, সংখ্যা ৩ : ১৫ই আশ্বিন, ১৪০০, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)

## মাসিক ও অন্যান্য অনিয়মিত সংকলন

*প্রিয় প্রজন্ম* : (ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯২ সংখ্যা)
*এক্সিসটেন্স* : (ঢাকা ট্রাইবাল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯২)

Dhaka University Institutional Repository



*ভ্যানগার্ড* : (জুলাই, ১৯৯২ সংখ্যা)
*হিল পিপলস্* : (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ সংখ্যা)
*ইকোনোমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি* : (ভল্যুম ১৫, নং ৩৬)
*লাড়েই* : (ট্রাইবুনাল ট্রুভেস্ট ইউনিয়ন, বিজু সংকলন, বাংলা ১৩৯০)

**সরকারী ও বেসরকারী তথ্য**

১০ই নভেম্বর স্মরণিকা, প্রকাশনায় : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, জনসংহতি সমিতি, ১৯৮৫ তিন সংসদ সদস্য, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা প্রেস ক্লাব, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮০

জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-১, (জুম্ম জনগণের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীনামা)

জনসংহতি সমিতির প্রচারপত্র-২, (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে আনীত পার্বত্য জেলা পরিষদ বিল-এর উপর জনসংহতি সমিতির বিবৃতি)

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে সাক্ষরিত শান্তিচুক্তি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিবেদন (১৯৯২-১৯৯৩)

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি।

**Daily Papers**

*The Bangladesh Observer* : (Dhaka, 9th July, 1992)
———— : (Dhaka, 3rd December, 1997)
———— : (Dhaka, 11th February, 1998)
*The Bangladesh Times* : (Dhaka, 8th October, 1992)
*The Daily Star* : (Dhaka, 27th December, 1992)
———— : (Dhaka, 28th February, 1998)
*The Independent* : (Dhaka, 11th February, 1998)
*The New Nation* : (Dhaka, 17th February, 1998)

**Weekly Magazine**

*The Weekly Guardian* : (28th April, 1981, London, UK.)

Dhaka University Institutional Repository



**Govt. and Non Govt. Documents**

*The report of the Chittagong Hill Tracts Commission*, May, 1991

*The Oxford English Dictionary*, Vol. V, H-K, London: Oxford University Press, 1933

The share of Hindu Community in the total population of Bangladesh was 33% in 1901, 28% in 1941, 22% in 1951, 18.5% in 1961, 13.5% in 1974 which came down to 12.1% in 1982, see, *Statistical Year book of Bangladesh 1982*, p. 91.

*The Constitution of the peoples Republic of Bangladesh* (As modified up to 28th February 1979), Ministry of law and Parliamentary Affairs, Govt. of Bangladesh, p. 5 also see Appendix XVII, pp. 152-4.

*Census Report of Bengal*, 1931
*Vide Bengal Govt. Act* XXIII dt. 1.8.1860

*An account of Chittagong Hill Tracts*, Jana Sanhati Samity, 14th July, 1982.

*17 D.L.R.* (1665)

Life is not ours-*The Chittagong Hill Tracts Commission*, April, 1994.

*Statistical Pocket Book of Bangladesh*, B.B.S. 1991

*Bangladesh Administrative Map*, Prepared by Graphosman, Dhaka, 1992.

Government of the people's Republic of Bangladesh, Ministry of planing, *Bangladesh population census Report*, 1974 National Vol. (Dhaka : 1977), p. 27, Table 26 and 27.

Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Finance, *Bangladesh Economic Survey*, 1977-78 (Dhaka : 1978) p. 1.

*The Chittagong Hill Tracts Militarization, Oppression and the Hill Tribes anti Slavery.*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

# পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বিবরণ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

## ক) সাধারণ :

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে ;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরিকৃত করিয়াছেন ;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে ;

| | |
|---|---|
| ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনিত একজন সদস্য | ঃ আহ্বায়ক |
| খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান | ঃ সদস্য |
| গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি | ঃ সদস্য |

৪। এই চুক্তি উভয় পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

## খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ / পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয় পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন

*Dhaka University Institutional Repository*



ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ ( $\frac{১}{৩}$ ) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪-মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন্ সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর' শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

*Dhaka University Institutional Repository*



৮। ১৪ নং ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শুন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পরিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিক ভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে ।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে ।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ" এবং "চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফের ও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে । একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পরিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ- ধারা (১) ও উপ-ধারা (২)এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক)৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদন ক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা(২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত,বরখাস্ত,অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

*Dhaka University Institutional Repository*



১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) -এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কতৃর্ক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত, এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থবৎসর শেষ হইবার পূর্বে যেকোন সময় সেই অর্থবৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০,৫১,ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্মে আইনের সহিত সংগতি পূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিত ভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারায় "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ক) ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

*Dhaka University Institutional Repository*



খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'সহায়তা দান করা' শব্দগুলি বলবৎথাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (জবংবৎধবফ) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ভকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (ভৎরহমব ধধহফ) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নং ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন কর হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উথাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

*Dhaka University Institutional Repository*



৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২)-এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ"- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলার প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা; (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা; (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যান;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

Dhaka University Institutional Repository



ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুন চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খণিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

## গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতি হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

| | |
|---|---|
| চেয়ারম্যান | ১ জন |
| সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) | ১২ জন |

Dhaka University Institutional Repository



| | |
|---|---|
| সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) | ২ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) | ৬ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) | ১ জন |

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মারমা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক, ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদের সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

*Dhaka University Institutional Repository*



খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারি শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা ;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান ;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা ;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

## ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

*Dhaka University Institutional Repository*



পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন। ঃ

১। ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ই মার্চ, '৯৭ ইং তারিখ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপকাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পারিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;

*Dhaka University Institutional Repository*



ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository



১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিরদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনাবাহিনী (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা, ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository



বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
৮) সাংসদ, বান্দরবান
৯) চাকমা রাজা
১০) বোমাং রাজা
১১) মং রাজা
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
(আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Dhaka University Institutional Repository



## পরিশিষ্ট - ২

## SECRET

Govt. Of the Peoples Republic of Bangladesh
Office of Deputy Commissioner, CHTs.
Memo No. 1025(9)C Dt. Rangamati, 15th sept./80

From: Mr. Ali Haider Kahan
Deputy Commissioner
Chittagong Hill Tracts.

To: Mr.....

Sub: settlement of landless non-tribal families in CHTs.-2nd Phase.

With reference to our discussion in Dacca on 21-8-80 and reference ot Commissioner. Chittagong Division's letter No. 66(9)/C dt. 4-9-80 on the above noted subject. I furnish below a guideline regarding the programme of settlement of landless non-tribal families form other districts in CHTs:-

1) Selection of families should be completed by 15th Oct. 80

2) The Chairman of the Union Parishads concerned will issue identity cards to the selected families in the form enclosed at Annexene (A)

3) Names of families groupwise should be sent to us by 22nd October/80. On receipt of these lists we shall decide as to where they will be rehabilitated and shall indicated to you on which dates the groups shoul repot to the reception centre at the Haji camp (pilgrimage camp), Chittagong.

4) At the reception centre an officer will take care of the settlers and will make arrangements for their jounies to the rehabilitation blocks. The settlers will however arrange their own food.

5) At the reception centre settlers will be given taka 200/- per family and on their arrival at their rehabilitation blocks they will be paid another installment of taka 500/-. After that, each family will be given further grants © taka 200/- per month for five more months. In addition for 6 months the settlers will be given 12 seers of wheat per family per week under Food For Work Programme for construction of their own houses, reclaiming their land, making village roads for them and for digging tanks in their own paras (areas). For another six months there will be provision for wheat under strict Food For Work Programme.

6) In rehabilitation blocks each family will be settled with khas land at the following rate:

1. 5 acres hilly land
2. 4 acres mixed land
3. 2.5 acres paddy land

I enclose here with an annexure `B` an instruction for the Chairman of the Union Parishad where from the families will be selected.

Sd/- Ali Haider Khan
D.C.
Chittagong Hill Tracts.

Dhaka University Institutional Repository



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

বিকা(কল্যাণ)ম-৭(৯)/৯০(প্রঃ)/২৭ তারিখ- ২৯/১০/৯০ইং / ১৩/০৭/৯৭বাং

স্মারক

বিষয়ঃ- chittagong hill Tracts Regulation. 1900 কার্যকারিতা প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে নিমস্বাক্ষরকারী জানাচ্ছে যে, পার্বত্য জেলা সমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) ১৯৮৯ প্রণীত হওয়া সত্বেও উক্ত আইনের (২) নং ধারাতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সরকার,সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে সে তারিখ হতে এ আইন বলবৎ হবে। সরকারের নিকট বর্ণিত আইনটির বলবৎ তারিখ এখন নির্ধারণ করা হয়নি।

২। এ বিষয় সকল বিভ্রান্তি অপনোদনের লক্ষ্যে এই মর্মে আদিষ্ট হয়ে স্পষ্টিকরণ করা হচ্ছে যে, chittagong hill tracts Regulation.1900 এখন ও প্রচালিত আইন বলে বিবেচিত এবং এর আওতায় বিবিধ কার্যক্রম নিস্পন্ন করা সম্পূর্ণ আইন সম্মত। যত দিন পর্যন্ত সরকার পার্বত্য জেলা সমূহ ( আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ এর বলবৎ করার তারিখ স্থির করে গেজেট প্রজ্ঞাপন দেবেন ততদিন পর্যন্ত chittagong hill tracts regulation.1900 (REGULATION 1 OF 1900) উক্ত আইন সমপূর্ণ বহাল এবং কার্যকর থাকবে।

৩। ইহার সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।

(মোঃ আশিকুল হক চৌধুরী )
পরিচালক (প্রশাসন)

বিতরণঃ -কার্যার্থে

চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ,
রাঙ্গামাটি /বান্দরবন / খাগড়াছড়ি।

বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ
চট্টগ্রাম।

জেলা প্রশাসক
রাঙ্গামাটি/ বান্দরবন/ খাগড়াছড়ি।

Dhaka University Institutional Repository



RESTRICTED

Khagrachari Zone
Khagrachari cantonment
Telephone : Military: Nil

5030/9/ 59/op

21 August 86

See Distribution:

DISBANDMENT OF CLOTH:

1. No tribals will put on olive green and black shirts/pants with immediate effect.

2. Please inform all Chairman's and Members of Union Councils and Headmans and Karbaaries of Mouszas and Paras.

Sd/-
MD. ANISUR RAHMAN
Major
for Zone commander

Distribution :
Action :
Upazila Chairman, Khagrachari
Upazila Chairman, Matiranga

Memo No. 667 (50)/Gnl, Dated. 30.08.86
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Chairman (All UPs)
2. Member (All ward of UPs)
3. Headmen (All Mouzas)
4. Karbari (All Paras)

Chairman
Upazila Parishad,
Khagrachari Sadar Upazila.

Dhaka University Institutional Repository



SECRET

Commissioner
Chittagong Division

Memo No. 665-C.

To: Mr.

It has decided that landless/river erosion affected people from your district will be settled in Chittagong Hill Tracts (CHTS). The settlement will be done in selected Zones and each family will be given Khas land free of cost according to the following scale:-

| | |
|---|---|
| Plain land | $2^1/_2$ acres. |
| Plain and bumpy mixed | 4 acres. |
| Hilly land | 5 acres. |

I has been decided that you will send 5,000 families. You are requested to collect Particulars of intending and suitable families from the Chairman of the concerned Union Parishads sought them out and furnish list to the Deputy Commissioner, CHTs through special messenger by the 30th of Sep./80 at the latest. To keeppaper record of the selected settlers, group leaders and issue of Identity card in all the districts in an uniform manner, detail guidelines have been prepared (copy enclosed) so that you can ensure strict compliance of the concerned Union Parished Chairman.

It is desire of the Govt. that the concerned deputy commissioner will give top to this work and make the programme a success. You are requested to immediately call a meeting of the concerned Chairman, Union Parishads and give them detailed instruction in the matter.

I would like to have a report about the action taken by you in the matter by 15.9.80 positively for information of the Govt.

Sd/-Saifuddin Ahmed,
5-9-80
Commissioner
Chittagong Division.

Dhaka University Institutional Repository



# পরিশিষ্ট - ৩

## সারণী - ১

### নৃতত্ত্বগত, আকৃতিগত ও বিভিন্ন গ্রুপ ভিত্তিক উপজাতীয়দের তালিকা:

| আসল নাম | বিকল্প নাম | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ১. চাকমা | থিক, তুই-থিক | আরাকানী গ্রুপ |
| ২. মারমা | মগ, মোগ, মারামগ্রী | ভিয়া |
| ৩. ত্রিপুরা | টিপরা, টিপ (পি) ইরা | ত্রিপুরা গ্রুপ |
| ৪. তঞ্চঙ্গা | | |
| ৫. রিয়াং | | |
| ৬. মুরং | মুরাং ম্রুং | |
| ৭. লুসাই | | কুকি গ্রুপ |
| ৮. পাংখু | পাংখো, পাংখিন, পাংকো | |
| ৯. বম | বনযোগী, বম, বনযুগী | মিজো |
| ১০. চাক | | |
| ১১. খুমিয়া | খুমি | |
| ১২. ম্রো | ম্রুং, ম্রু | |
| ১৩. খিয়াং | খাইয়াংস, খাংইগাস, সো, খুয়ান | |

সূত্র : Dr. Mizanur Rahman Shelley : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The untold Story*, CDRB, Dhaka 1992 P. 45.

## সারণী - ২

| জেলা | আয়তন | থানা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|---|
| খাগড়াছড়ি | ২৭০০ বর্গ কিলোমিটার | ৮ টি | ৩৪ টি | ১২৭ টি | ৪২৪ টি |
| রাঙামাটি | ৬১১৬ বর্গ কিলোমিটার | ১০ টি | ৪৭ টি | ১৩৬ টি | ১০৩৭ টি |
| বান্দরবান | ৪৪৭৯ বর্গ কিলোমিটার | ৭ টি | ২৯ টি | ৯৩ টি | ৬৭২ টি |

সূত্র : ষ্ট্যাটিসটিক্যাল পকেট বুক বাংলাদেশ ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository



সারণী - ৩

১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নাম ও জনসংখ্যা :

| ক্রমিক নং | উপজাতির নাম | বান্দরবান | রাঙামাটি | খাগড়াছড়ি | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বম | ৬,৪২৯ | ৫৪৯ | - | ৬,৯৭৮ |
| ২. | চাক | ১,৬৮১ | ৩১৯ | - | ২,০০০ |
| ৩. | চাকমা | ৪,১৬৩ | ১৫৭,৩৮৫ | ৭৭,৮৬৯ | ২৩৯,৪১৭ |
| ৪. | খুমী | ১,১৫০ | ৯১ | - | ১,২৪১ |
| ৫. | খিয়াং | ১,৪২৫ | ৫২৫ | - | ১,৯৫০ |
| ৬. | লুসাই | ২২৬ | ৪৩৬ | - | ৬৬২ |
| ৭. | মারমা | ৫৯,২৮৮ | ৪০,৮৬৮ | ৪২,১৭৮ | ১৪২,৩৩৪ |
| ৮. | মুরুং | ২১,৯৬৩ | ৩৮ | ৪০ | ২২,০৪১ |
| ৯. | পাংখো | ৯৯ | ৩,১২৮ | - | ৩,২২৭ |
| ১০. | তঞ্চঙ্গা | ৫,৪৯৩ | ১৩,৭১৮ | - | ১৯,২১১ |
| ১১. | ত্রিপুরা | ৮,১৮৭ | ৫,৮৬৫ | ৪৭,০৭৭ | ৬১,১২৯ |
| ১২. | ম্রো | - | ১২৬ | - | ১২৬ |
| ১৩. | রাখাইন | - | ৭০ | - | ৭০ |
| ১৪. | সাঁওতাল | - | - | ২৫৩ | ২৫৩ |
| ১৫. | অন্যান্য | ২২৯ | ১৭৪ | ১০২ | ৫০৫ |
| | মোট | ১১০,৩৩৩ | ২২৩,২৯২ | ১৬৭,৫১৯ | ৫০১,১৪৪ |

সূত্র : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Government of Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository



## সারণী - ৪

### উপজাতি-অউপজাতি জনসংখ্যার আনুপাতিক হার

১। অউপজাতি = ৪৬০,৮৩৩ (৪৩.৪%)

২। উপজাতি = ৫১৩৬১২ (৫৬.৬%)

শিক্ষার হার

| | |
|---|---|
| চাকমা | ৫৬% |
| মারমা | ২০% |
| ত্রিপুরা | ২০% |
| তঞ্চঙ্গা | ২০% |
| লুসাই | ১৫% |
| বম | ১৫% |
| খুমি | ০৫% |
| বাঙ্গালী | ২৮% |

সূত্র : *আহা পার্বত! আহা চট্টগ্রাম !!* (মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৯৭ পৃষ্ঠা- ২০২)

## সারণী - ৫

### পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনসংখ্যার শতকরা হিসাব

| | | |
|---|---|---|
| চাকমা | : | ৬৭.৪৫% |
| ত্রিপুরা | : | ১২.৮৮% |
| মগ | : | ৭.৭৮% |
| অন্যান্য | : | ১.৪৫% |
| বাঙ্গালী | : | ১০.৪৬% |

সূত্র : Dr. Mizanur Rahman Shelley : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The untold Story*, CDRB, Dhaka 1992 P. 45.

Dhaka University Institutional Repository



সারণী - ৬

## উপজাতিদের বিশেষ শিক্ষা কোটা

| | |
|---|---|
| মেডিকেল কলেজ | ১২ |
| ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় | ০৬ |
| টেকনিক্যাল কলেজ | ৩০ |
| কৃষি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় | ০৬ |
| রাঙামাটি প্যারামেডিক্যাল স্কুল (মোট আসনের প্রতি বছর) | ২০% |
| ক্যাডেট কলেজ | ০৩ |
| গার্লস ক্যাডেট কলেজ | ০৩ |

সূত্র : Dr. Mizanur Rahman Shelley : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The untold Story*, CDRB, Dhaka 1992 P. 136.

সারণী - ৭

## (ভূমি বিন্যাস (বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম)

| ধরণ | পরিমান (একর) |
|---|---|
| অরণ্য ভূমি | ২৯,০২,৭৩৯ |
| চাষযোগ্য জমি | ৯৩,০০২ |
| (এর মধ্যে ৫৪,০০০ একর কাপ্তাইবাঁধে নিমজ্জিত হয়) | |
| চাষের অযোগ্য জমি | ৪৫,০০০ |
| মোটেই চাষাবাদযোগ্য নয় এমন জমি | ১,৭০,৮৯৯ |
| পতিত জমির পরিমান | ১০,০০০ |
| পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন বা সর্বমোট ভূমির পরিমান | ৩২,৫৯,৫২০ |

সূত্র : প্রদীপ্ত খীসা, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা' সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository



সারণী - ৮

**তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের বিন্যাস**

| সম্প্রদায় | রাঙামাটি | খাগড়াছড়ি | বান্দরবান |
|---|---|---|---|
| চাকমা | ১০ | ০৯ | ০১ |
| মারমা | ০৪ | ০৬ | - |
| তঞ্চঙ্গা | ০২ | - | ০১ |
| ত্রিপুরা | ০১ | ০৬ | - |
| লুসাই | ০১ | - | - |
| পাংখু | ০১ | - | - |
| খিয়াং | ০১ | - | - |
| মারমা এবং খিয়াং | - | - | ১০ |
| মুরং | - | - | ০৩ |
| ত্রিপুরা এবং উলাই | - | - | ০১ |
| বম, পাংখু এবং লুসাই | - | - | ০১ |
| খুমী | - | - | ০১ |
| চাক | - | - | ০১ |
| মোট | ২১ | ২২ | ২০ |
| বাঙালী | ১০ | ০৯ | ১১ |
| সর্বমোট | ৩১ | ৩১ | ৩১ |

সূত্র : Dr. Mizanur Rahman Shelley : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The untold Story*, CDRB, Dhaka 1992 P. 143.

*Dhaka University Institutional Repository*



## সারণী - ৯

### (প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বছরওয়ারী হিসাব)

| আর্থিক বছর | মোট খরচ |
|---|---|
| ১৯৭৮-৭৯ | ৬১,৭৯,০৯০.৪০ |
| ১৯৭৯-৮০ | ১,২৯,৩৮,১৮০.৮০ |
| ১৯৮০-৮১ | ১,২৩,৬৫,৯৮৬.৮০ |
| ১৯৮১-৮২ | ১,৪৩,৬৯,৩৯২.৮০ |
| ১৯৮২-৮৩ | ১,৭৩,২৫,১৬২.৪০ |
| ১৯৮৩-৮৪ | ২,৬৭,৪৭,৬৫১.২০ |
| ১৯৮৪-৮৫ | ৩,৬২,০৫,৮০০.০০ |
| ১৯৮৫-৮৬ | ২,৭৮,৩২,৫০০.০০ |
| ১৯৮৬-৮৭ | ২,৩৭,৮০,০০০.০০ |
| ১৯৮৭-৮৮ | ২,৩০,৭৬,৯০০.০০ |
| ১৯৮৮-৮৯ | ৩,৯৮,৬২,৫০০.০০ |
| ১৯৮৯-৯০ | ৫,২৭,০১,২৫০.০০ |
| ১৯৯০-৯১ | ৫,৫৭,৪৮,০০০.০০ |
| ১৯৯১-৯২ | ৫,৮৬,৮৬,০০০.০০ |
| ১৯৯২-৯৩ | ৭,৪৩,১৪,০৫০.০০ |
| ১৯৯৩-৯৪ | ১২,০৫,২৫,৭০০.০০ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ১২,০৫,১৭,৮০০ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ১২,৫৬,৮৪,৯০০.০০ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ১৩,৮৫,৮৯,১০০.০০ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৭,১০,৯৯,৫৫০.০০ |
| সর্বমোট | ১০৫,৯৪,৪৯,৫১১.৪০ |

সূত্র ঃ ১৭.২.৯৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য।

*Dhaka University Institutional Repository*



## সারণী - ১০

## পার্বত্য এলাকায় সহিংস ঘটনায় নিহতের

## বছরওয়ারী সরকারী হিসাব

| | নিহতের সংখ্যা |
|---|---|
| ১৯৭৭ | ৯ |
| ১৯৭৮ | ৫ |
| ১৯৭৯ | ৯ |
| ১৯৮০ | ৮২ |
| ১৯৮১ | ৮ |
| ১৯৮২ | ২০ |
| ১৯৮৩ | ৭ |
| ১৯৮৪ | ১১১ |
| ১৯৮৫ | ৩০ |
| ১৯৮৬ | ৮২ |
| ১৯৮৭ | ১০৮ |
| ১৯৮৮ | ৮৭ |
| ১৯৮৯ | ৫৫ |
| ১৯৯০ | ৬৮ |
| ১৯৯১ | ৬৫ |
| ১৯৯২ | ৮৫ |
| ১৯৯৩ | ১৫ |
| ১৯৯৪ | ১৬ |
| ১৯৯৫ | ১১ |
| ১৯৯৬ | ৫০ |
| ১৯৯৭ | ১৪ |
| সর্বমোট | ৯৩৭ জন |

সূত্র ঃ ১৭.২.৯৮ ইং তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository



## সারণী - ১১

### পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আর্থ-সামাজিক প্রকল্প

### ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে ১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত

মিলিয়ন টাকায়

| ক্রমিক | সেক্টর | ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছর থেকে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছর পর্যন্ত | | ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরের প্রকল্প | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | প্রকল্প সংখ্যা | মূল্য | প্রকল্প সংখ্যা | মূল্য |
| ১। | কৃষি | ৮৯ | ৬০.৭৯৪ | ১ | .১৩১ |
| ২। | যোগাযোগ | ১২২ | ৫৩.৯৭৮ | ১৬ | ৪.১২৫ |
| ৩। | শিক্ষা | ১৫৬ | ৫৫.৯৭১ | ২৪ | ৫.৮২৩ |
| ৪। | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ৫৮ | ২৪.৩১১ | ১৭ | ৩.৭৭১ |
| ৫। | নির্মান কাজ (দালান কোঠা) | ৩৫ | ৩১.৩৫২ | ৩ | .৮৫০ |
| ৬। | সমাজ কল্যান | ২০৪ | ৬৪.৬১৯ | ২০ | ৪.৩০০ |
| ৭। | কুটির শিল্প | ২৮ | ৪.৪৯১ | - | - |
| ৮। | রিজার্ভ ফাণ্ড | - | - | ১ | ২.০০০ |
| | | ৬৯২ | ২৯৫.৫১৬ | ৮২ | ২১.০০০ |
| ৯। | বোর্ডের উন্নয়ন ব্যয় | - | ৩৬.১৭০ | - | ৬.৫০০ |
| | | ৬৯২ | ৩৩১.৬৮৬ | ৮২ | ২৭.৫০০ |

সূত্র : সূত্র : Dr. Mizanur Rahman Shelley : *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: The untold Story*, CDRB, Dhaka 1992 P. 159.